কলই সমাজের ইতিবৃত্ত

ডঃ প্রদীপনাথ ভট্টাচার্য্য

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

কলই সমাজের ইতিবৃত্ত

ডঃ প্রদীপনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশকঃ
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
আগরতলা, ত্রিপুরা
২০১৫

কলই সমাজের ইতিবৃত্ত

মুদ্রণ ইতিহাস

- পুস্তকের নাম ঃ লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায়।
- লেখকের নাম ঃ প্রদীপ নাথ ভট্টাচার্য্য
- প্রকাশক ঃ গবেষণাধিকার,উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরেব পক্ষে শ্রী চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়।
- প্রকাশকাল ঃ ১৯৮০ইং

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

- পুস্তকের নাম ঃ কলই সমাজের ইতিবৃত্ত
- প্রকাশক ঃ উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, আগরতলা
- প্রকাশকাল ঃ ২০১৫ইং
- মুদ্রণ ঃ নিউ ক্যুইক প্রিন্ট, ১১ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা।
- অক্ষর বিন্যাস ও প্রচ্ছদ ঃ সমর সেন
- মূল্য ঃ ১৩৬ টাকা।

ত্রিপুরা সরকার
উপজাতি গবেষণা অধিকার
প্রথম সংস্করণের পরিচিতি

ত্রি পুরা রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন দফার উপজাতিদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন প্রকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা অধিকার কর্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে কুকি, নোয়াতিয়া প্রভৃতি উপজাতিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়ছে।

"লোকবৃত্তের আলোক কলই সম্প্রদায়" নামক পুস্তিকাটির লেখক শ্রীপ্রদীনাথ ভট্টাচার্য্য। ইহাতে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত কলই সম্প্রদায়ের পরিচিতি, প্রথানুগ শাসন ব্যবস্থা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সমস্ত তথ্য লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন এজন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য।

আমরা আশা করি, ত্রিপুরার উপজাতিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকারী ও জ্ঞানপিপাসু গবেষকগণের কাজের উপকরণ হিসাবে এই পুস্তকখানি সহায়ক হইবে।

আগরতলা, সুধীর শর্মা
তাং ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং। অধিকর্তা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ত্রিপুরার কলই সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহ দীর্ঘদিনের। কিন্তু তাদের বিষয়ে কিছু জানার একান্ত আগ্রহ থাকা সত্বেও তাদের সম্পর্কে কোন বই না থাকায় আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে এতদিন তাদের সম্পর্কে কোন কিছু লেখার সাহসই হয়নি। চাকুরীর খাতিরে দীর্ঘদিন অমরপুর মহকুমায় থাকার ফলে কলই সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে বেশ মেলামেশার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তাদের সমাজের প্রাচীন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও সাক্ষাৎকারের ফলে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি তা-ই এ বইয়ে উপস্থাপন করার প্রয়াস করেছি মাত্র।

কোন দেশ, জাতি বা উপজাতির লোকবৃত্তের পূর্ণ বিবরণ এতো ক্ষুদ্র পরিসরে পরিস্ফুটন প্রায় অসম্ভব। তদুপরি এই প্রসঙ্গে এর আগে প্রকাশিত কোন রচনা বা পুস্তক না থাকায় কলই সম্প্রদায়ের লৌকিক তথা শ্রুতিসাহিত্যের উপর এবং আমার নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যাদির উপরই আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে। আমার এই বইয়ের তথ্যাবলী ভবিষ্যত গবেষকদের কাজে লাগলে নিজের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বৈশ্যমুনিপাড়া নিবাসী শ্রীঅমূল্য কলই, শ্রীউমাকান্ত কলই, যন্ত্রণাপাড়া নিবাসী শ্রীহরেন্দ্র কলই, শ্রীব্যাসমুনি কলই, শ্রীগণেশ কলই এবং তৈছাং-এর শ্রীতারিণী কলই আমাকে সক্রিয় সাহায্য করায় তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

ডাইরেক্টরেট অব রিসার্চের শ্রী সি, এস, চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এম, রামগোপাল সিং এবং অন্যান্য কর্মীগণ যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন সে জন্য তাদের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই বইটির ভাষাগত বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিকগুলি দেখার ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীমাখনলাল দাস এবং অন্যান্য বিষয়ে শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত (পল্টুদা) ও শ্রীমৃনালকান্তি দেববর্মণ অকৃপণ সাহায্য করেছেন।

প্রদীপনাথ ভট্টাচার্য
আগরতলা

ত্রিপুরা সরকার
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
আগরতলা
দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্-কথন

১৯৮০ ইং সনে প্রকাশিত 'লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায়' শীর্ষক পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং ঐ পুস্তকটি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছে। পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং লেখক ডঃ প্রদীপনাথ ভট্টাচার্য্য এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

আশাকরি এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণটিও পাঠক ও গবেষকদের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হবে এবং সমানভাবে সমাদৃত হবে।

আগরতলা,
১লা ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং।

সুনীল দেববর্মা
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের দীর্ঘ তিন দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্প্রতি উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায় গ্রন্থটির পুণর্মুদ্রণের এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং গ্রন্থটির পরিবর্ধণ ও পরিমার্জণের জন্য আমি আদিষ্ট হই। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থটি পরিমার্জণে সচেষ্ঠ হই। এই দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আমার বিশ্বাস সুধী গবেষক ও পাঠকবর্গ সাগ্রহে এই সংস্করণটি গ্রহণ করবেন এবং যদি কোন বিষয় পরিবেশনের প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তাদের মূল্যবান পরামর্শ গ্রন্থাকার সাদরে গ্রহণ করবেন। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি উ পেক্ষনীয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের তথ্য ও বিভিন্ন ছবি সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রী সুনীল কলই। তাছাড়া বৈশ্বমুনি পাড়া নিবাসী বর্তমান রায় শ্রী উমাকান্ত কলই ও দ্বারাকাই কলই পাড়া নিবাসী প্রাক্তন রায় শ্রী শচীন্দ্র কলই পুস্তকটির প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সহায্য করেছেন।

ত্রিপুরার উপজাতি গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃত ড. জগদীশ গণচৌধুরী গ্রন্থটির পরিমার্জনের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ।

উপজাতিগবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের ডাইরেক্টর শ্রী সুনীল দেববর্মা মহাশয়, ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রী প্রফুল্ল রিয়াং, শ্রী বিদ্যুতকান্তি ধর ও অন্যান্য কর্মীগণ আমাকে যেভাবে উৎসাহ ও সাহায্য করেছেন সে জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষাগত খুটিনাটি দিক গুলি দেখার ব্যাপারে ভ্রতৃপ্রতিম শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন।

আগরতলা
তাং ২৭শে অক্টোবর ২০১৫ ইং

প্রদীপনাথ ভট্টাচার্য্য
আগরতলা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ	ত্রিপুরায় কলই	১-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	অর্থনীতি	৩৬ - ৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	সমাজনীতি	৩৮ - ৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	ধর্মনীতি	৮৪ - ৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	গ্রাম প্রশাসন ও রাজনীতি	৯৬ -১০৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	পরিবর্তন ও পর্যবেক্ষণ	১০৭ - ১১৫
শেষ কথা	ঃ		১১৬-১১৭

প্রথম অধ্যায়

ত্রিপুরায় কলই

কলই জনসংখ্যা

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অনত্যম। মোট ১০,৪৭৭ বর্গ কিঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট এই রাজ্যের প্রায় ষাট (৬০) শতাংশ ভূমিই পাহাড়ী অঞ্চল। এই রাজ্যে ১৯টি উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক অ-উপজাতি জনগণ দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছে। ২০০১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা হল - ৩১,৯৯,২০৩ জন। তন্মধ্যে উপজাতি জনসংখ্যা ৯, ৯৩,৪২৬ যা মোট জনসংখ্যার ৩১.০৫% বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরাতে কলইদের জনসংখ্যা ১০ হাজার (বেসরকারী হিসাবে) যা মোট হালাম জনসংখ্যার ২১.১৬ শতাংশ। ত্রিপুরায় বসবাসকারী ১৯টি উপজাতি গোষ্ঠী হল ঃ- ১) ত্রিপুরী ২) রিয়াং ৩) জমাতিয়া ৪) চাকমা ৫) হালাম ৬) নোয়াতিয়া ৭) মগ ৮) লুসাই ৯) উচুই ১০) কুকি ১১) গারো ১২) মুণ্ডা ১৩) ওরাং ১৪) সাঁওতাল ১৫) খাসিয়া ১৬) ভীল ১৭) ছাইমাল ১৮) ভূটিয়া ও ১৯) লেপচা।

বিভিন্ন বইয়ে কলই সম্প্রদায়কে উপরোক্ত পাঁচ নং (৫ নং) "হালাম" সম্প্রদায়ের একটি শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে যদিও কলইদের সংখ্যা ত্রিপুরার অন্যান্য অনেক উপজাতি গোষ্ঠী যেমন ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ইত্যাদি অপেক্ষা নগণ্য কিন্তু হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শাখার

(গোষ্ঠীর) মধ্যে কলইদের স্থান উল্লেখযোগ্য। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩১ ইং) সেন্সাসে কলইদের স্ত্রী ও পুরুষ নিয়ে মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৬৯৮ জন (পুরুষ ৮৭০ জন এবং স্ত্রী ৮২৮ জন)। পক্ষান্তরে হালাম সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা (১৮টি শাখার) দেখানো হয়েছে ১২,০৫৪ জন (পুরুষ ৬২৩১ জন এবং স্ত্রী ৫৮২৩ জন)। সুতরাং ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী হালাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কলইদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪%।

২০০১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী হালাম জনসংখ্যা - ৪৭,২৪৫ যা মোট উপজাতির মধ্যে - ৪.৯৩%। বর্ত্তমানে সমগ্র ত্রিপুরাতে কলইদের জনসংখ্যা প্রায় দশ (১০) হাজার (বেসরকারী হিসেবে) এবং এই সংখ্যা হালাম সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১.১৬%। ত্রিপুরার তিনটি জেলার মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেই কলইরা সর্বাধিক সংখ্যায় বাস করেন। বর্ত্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুলাই ও দামছড়া এলাকায় কিছু সংখ্যক কলই পরিবার বসবাস করছেন। কিন্তু তাঁরা দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকেই অর্থনৈতিক কারণে ইদানিংকালে ঐ সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ত্রিপুরার মধ্যে কলইরা দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুর মহকুমার বৈশ্যমুণি পাড়া, যন্ত্রনাপাড়া, হলুয়া,

ধনলেখা, তৈছাং, তৈদু, জাকসাই, পঙ্কু ইত্যাদি গ্রামগুলিতে এবং পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমার ব্রহ্মছড়া, তুইসিন্দ্রাই, তৈকৈ এবং সদর মহকুমার দারখাই, তৈছারাংচাক, প্রভৃতি গ্রামগুলিতে সবচেয়ে বেশী সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করেন। জনসংখ্যার দিক থেকে কলইদের সংখ্যা কম হলেও শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিগুলি অপেক্ষা কলইরা কোন অংশেই অনগ্রসর নয়।

কলই নামের তাৎপর্য্য

'কলই' নামটি কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য বা অভিমত না থাকায় কলই নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলেই তাঁদের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে সুবিধা হবে।

কলইদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ব্যক্তি মনে করেন কলই শব্দটি কুলুই (নরম) শব্দ থেকে এসেছে। তাঁদের ভাষায় কুলুই শব্দের অর্থ হল নরম বা নম্র। তাঁদের মতে যেহেতু কলইয়া স্বভাবের দিক দিয়ে অন্যান্য উপজাতিদের থেকে অপেক্ষাকৃত নম্র অর্থাৎ উগ্র নন সেই জন্যই তাঁরা অন্যান্যদের কাছে কলই নাম পরিচিত হয়েছেন।

আবার অনেকের মতে ত্রিপুরার মহারাজগণ কলইদেরকে কল্ করে অর্থাৎ কৌশল করে আয়ত্ব করেছিলেন বলে পরবর্ত্তীকালে তাঁরা কলই নামে পরিচিতি হয়েছেন। এব্যাপারে তাঁদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "কলখ্লায়ই রম্মাণি বাগৈ কলই হিন জাগ" অর্থাৎ কৌশল করে তাঁদেরকে ধরা হয়েছিল বলেই তাঁরা কলই নামে পরিচিত।

অন্যদিকে কলইদের মধ্যে অপর এক শ্রেণীর অভিমত হল কলই শব্দটি কল (বল্লম) থেকে এসেছে। তাঁদের মতে কলইরা যুদ্ধের সময় কল (বল্লম) ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন বলে তাঁরা কলই নামে পরিচিত হয়েছেন। অবশ্য এইসব মতের পক্ষে কোন ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলইদের আদিবাসভূমি ও ত্রিপুরায় আগমনের কাহিনী

কলইদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল সে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত থাকলেও তাঁরা যে ত্রিপুরার বাইরের কোন স্থান থেকে এসেছেন এ

ব্যাপারে তাঁরা একমত। তাঁদের আদিবাসভূমি সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য না পাওয়ায় তাঁদের প্রাচীন ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীর উপরই নির্ভর করতে হয়।

অনেকের মতে কলইরা যেহেতু হালাম বলে পরিচিত, সুতরাং হালামদের আদিবাস 'খরপুইতাভূম'ই হল কলইদের আদিবাসভূমি। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস বিবরণীতে হালাম সম্প্রদায়ের আদিবাস ভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে "হালামগণের মতে 'খরপুইতাভূম' তাদের প্রথম জন্মস্থান। এইস্থান মণিপুর রাজ্যের উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। তৎপর ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্যস্থানে বিস্তৃত হয়েছে।" (১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস বিবরণী-পৃষ্ঠা ৮০)

হালামগণের আদিবাসভূমি সম্পর্কে কৈলাস সিংহের রাজমালায় ও উপরোক্ত মতের সমর্থন আছে।

এই মত কলইদের নিকট সর্বজনগ্রাহ্য নয়, কারণ হালামগণের জন্মস্থানই যে কলইদের জন্মস্থান হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সব হালামগণেরই যদি একই জন্মস্থান হত তবে হালামদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন নাম হত না। তাছাড়া কলইগণ আদৌ হালাম কিনা সে বিষয়েতো অনেকের সন্দেহ আছে। তদুপরি কলই অধ্যুষিত যে সমস্ত গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির সঙ্গে মণিপুর রাজ্যের উত্তরের পার্ব্বত্য প্রদেশ খরপুইতাভূমের সঙ্গে ভৌগোলিক দিক থেকে কোন সম্পর্ক না থাকারই কথা।

কলইদের মধ্যে কিছু অংশের অভিমত হল যে তাঁরা কুকি প্রদেশের থানাংচি নামক স্থান থেকে এসেছেন এবং তাঁরা মূলতঃ কুকি। কিন্তু এই অভিমত অধিকাংশ কলইগণই মেনে নিতে রাজী নন, কারণ কুকীদের ভাষা, নিয়ম কানুন ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের বিশেষ মিল নেই।

কলই সম্প্রদায়ের ওয়াপ্লম্ দফার একজন প্রাচীন ব্যক্তির অভিমত হল যে, তারা লালমাই পাহাড় অঞ্চলে 'নগেনপাকুলী তৈসা' নামক স্থান থেকে প্রথমে উদয়পুরের খুমপুইলং ও সদরের মধুবন এলাকায় আসেন এবং এখান থেকে জীবিকার জন্য ক্রমে ক্রমে অম্পি, তেলিয়ামুড়া, তৈদু প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী কলইগণের লালমাই থেকে আসার কোন ঐতিহাসিক তথ্য না থাকলেও কলই সম্প্রদায়ের প্রথম দিকের রায়গণ (প্রধান) যে সদরের মধুবন এলাকার ছিলেন, সে তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

অতীত ও বর্তমানের কলই অধ্যুষিত কিছু গ্রামের নাম ও অবস্থান		
১। টাকারজলা	১৩। লক্ষীধনপাড়া	২৫। দামছড়া
২। বৈরাগীপাড়া	১৪। উত্তর তৈদু	২৬। বাতিবন *
৩। জম্পুইজলা	১৫। তৈদুডেফা	২৭। মধুবন *
৪। তৈছারাংচাক	১৬। দক্ষিণ তৈদু	২৮। কোনাবন *
৫। বাটাপাড়া	১৭। ধনলেখা	২৯। ছাইমানরুয়া *
৬। দারখাই	১৮। হলুয়া	৩০। খুপিলং *
৭। চম্পাশর্মা	১৯। যন্ত্রণাপাড়া	৩১। লাউগাঙ্গ *
৮। বাহাওপাড়া	২০। বৈশ্যমুনিপাড়া	৩২। দোয়াপাথর *
৯। তুইসিন্দ্রাই	২১। তৈছাং	৩৩। চট্টগ্রাম *
১০। সর্দুকর্করী	২২। ছেরথুমপাড়া	৩৪। ধোপাপাথর *
১১। জাকসাই	২৩। ব্রহ্মছড়া	৩৫। আরাকান
১২। পঞ্চু	২৪। কুলাই	

*চিহ্নিত স্থানগুলিতে অতীতের কোন একসময় কলইরা বসবাস করত বলে জানা গিয়েছে।

কলই সম্প্রদায়ের প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য হল যে তাদের আদি বাসভূমি ছিল মণিপুর, লাউগাঙ, তুলসীমুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে। তাঁদের অভিমত হল যে, তাঁরা জুমচাষ করতে মণিপুর থেকে অগ্রসর হয়ে উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী কাকাক নামকস্থানে প্রথম আসেন। তখন তাঁরা যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করতেন এবং জুমচাষের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজাগণ বহু বৎসর পর তাঁদেরকে আয়ত্ব করার জন্য একজন বুদ্ধিমান শাসকের সাহায্যে কৌশল করে তাঁদেরকে আয়ত্ব করেন। এ ব্যাপারে কলইদের মধ্যে টাকা ছড়ানোর একটি গল্প আজও প্রচলিত আছে। এই গল্পে আছে যে, কলইরা এক সময় একটি শক্তিশালী যাযাবর উপজাতি ছিল। ত্রিপুরার মহারাজ তাঁদেরকে আয়ত্ব করতে না পেরে একজন বুদ্ধিমান শাসকের সাহায্যে গ্রহণ করেন এবং ঐ শাসক কলইদের বাসস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী

বৈশ্যমুনি পাড়ার শ্রীঅমূল্য কলই

পাহাড়গুলিতে লুকিয়ে টাকা ছড়িয়ে রাখলে কলইরা সংঘবদ্ধভাবে ঐ টাকা সংগ্রহ করতে একত্রিত হত। এভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁরা মহারাজার বশ্যতা স্বীকার করেন।

কলইদের আদিবাসভূমি সম্পর্কে অমরপুর মহকুমার বৈশ্যমুনি পাড়ার নিবাসী ত্রিশ বৎসর সর্দার পদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীঅমূল্য কলইর বক্তব্য হল যে, কলইগণ আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথমে আসেন। সেখান থেকে দোয়াপাথর, দোয়াপাথর থেকে মাইয়ামথংহাদুক, মাইয়ামথংহাদুক থেকে উদয়পুরের দিকে আসে এবং পরবর্ত্তীকালে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে বাতিবন, মধুবন, খুম্পুইলং, ছাতাড়িয়া, টাকারজলা, জম্পুইজলা, পিত্রা, অম্পি, তৈদু, বাহাত্তবাড়ী ছাইমানরুয়া, গঙ্গুরাই প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। কলইদের আগমন সম্পর্কে শ্রীঅমূল্য কলই কর্তৃক প্রদত্ত তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

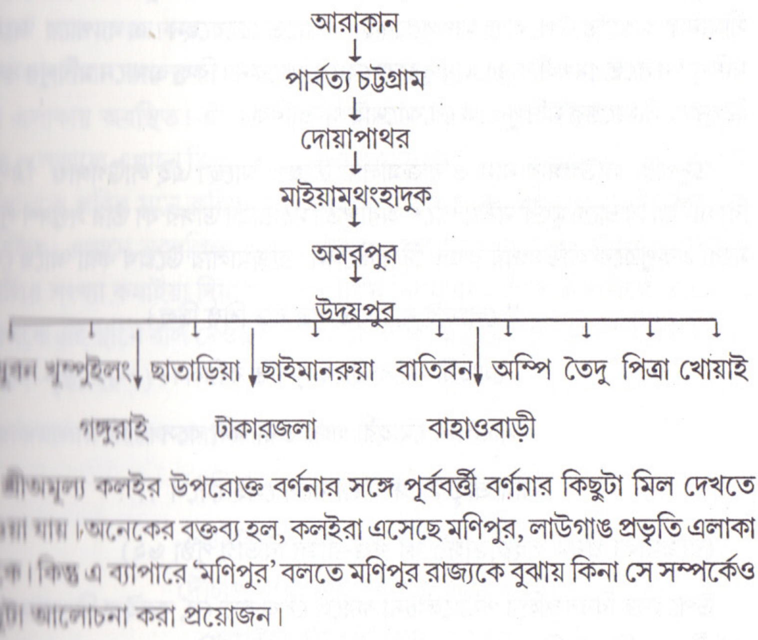

শ্রীঅমূল্য কলইর উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে পূর্ববর্ত্তী বর্ণনার কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়।অনেকের বক্তব্য হল, কলইরা এসেছে মণিপুর, লাউগাঙ প্রভৃতি এলাকা থেকে। কিন্তু এ ব্যাপারে 'মণিপুর' বলতে মণিপুর রাজ্যকে বুঝায় কিনা সে সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

'মণিপুর' এর পরিচয় রাজমালায় উল্লেখ করা আছে যে, "ইহা ত্রিপুরা রাজ্যস্থ বিলোনীয়ার সন্নিহিত মুহুরী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত জগৎপুর তহশীল কাছাড়ীর এলাকায় পতিত হইয়াছে। মণিপুরের একমাইল দূরবর্ত্তী উত্তর ধর্মপুরে উচ্চটীলার উপরে একটি কিল্লার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি

বিদ্যমান আছে। এই স্থানে সমসের গাজীর সহিত ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধ হয়"। (রাজমালার প্রথম লহর, মধ্যমণি-পৃষ্ঠা ২৬৩)

তাছাড়া ডাঙ্গর ফা তাঁর সতেরজন পুত্রের মধ্যে যখন রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর এক পুত্রকে তিনি মণিপুর দিয়েছিলেন বলে রাজমালার উল্লেখ আছে। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর কোন্ পুত্রকে মণিপুর দিয়েছিলেন তাঁর নাম রাজমালায় নেই। রাজমালায় উল্লেখ আছে যে-

"আর এক পুত্রে দিল মণিপুর স্থানে।
সতের পুত্রেরে রাজ্য দিলেক প্রমাণে।।"
(রাজমালা ১ম লহর, ডাঙ্গর ফা খণ্ড রাজ্য বিভাগ-পৃষ্ঠা ৬২)

সুতরাং এখানে মণিপুর বলতে পূর্ববর্ত্তী বক্তাগণ হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব সীমানার অন্তর্গত উপরোক্ত মণিপুরকেই বোঝাতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে অনেকে মণিপুর বলতে মেখলীরাজ্য মণিপুরকে বোঝে থাকেন। কিন্তু এখানে মণিপুর বলতে ত্রিপুরার সীমান্তের মণিপুরকে বোঝানোই স্বাভাবিক।

তদুপরি লাউগঙ্গার নাম ও রাজমালায় উল্লেখ আছে। এই লাউগঙ্গাও ত্রিপুরার বিলোনীয়া বিভাগে মুহুরী নদীর পাশে অবস্থিত। মহারাজা ডাঙ্গর ফা তাঁর সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে একপুত্রকে লাউগঙ্গায় রাজ্য দিয়েছিলেন। রাজমালায় উল্লেখ করা আছে যে,-

" লোমাই নামেতে পুত্র বড় শিষ্ঠ ছিল।
মোহরী নদীর তীরে নৃপতি করিল।।
লাউগঙ্গা মোহরী গঙ্গা তথা নদী বসে।
আর ভ্রাতৃ সঙ্গে রাজা বসে সেই দেশে ।।"

(রাজমালা প্রথম লহর,ডাঙ্গর ফা খণ্ড-রাজ্য বিভাগ পৃষ্ঠা ৬২)

উপরোক্ত বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কলইরা ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্ব সীমানা দিয়েই ত্রিপুরায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা সর্বাধিক।

অপরদিকে শ্রীঅমূল্য কলই প্রদত্ত তালিকাটি পর্য্যালোচনা করলেও বুঝা যায় যে, কলইরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ ত্রিপুরার দক্ষিশ পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে অমূল্যবাবু বর্ণিত কলইগণের ত্রিপুরায় আগমনের কাহিনীর

সঙ্গে রিয়াংদের ও ত্রিপুরায় আসার ইতিহাসের যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। রিয়াং লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের পূর্বে রিয়াংগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের 'কাচকক' নামক এক অত্যাচারী রাজার অধীনে বাস করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মগগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তাঁরা প্রথমে ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্ব সীমানা দিয়ে বিলোনীয়া ও অমরপুর মহকুমায় বসবাস আরম্ভ করেছিলেন (সম্ভবত চর্তুদশ শতকে)। সুতরাং রিয়াংদের মত কলইদেরও দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় আসা খুব অস্বাভাবিক নাও হতে পারে।

অমূল্য বাবু কলইদের ত্রিপুরায় আগমনের প্রথম স্থান হিসাবে যে 'দোয়াপাথরে'র উল্লেখ করেছেন তাও ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বলে রাজমালায় উল্লেখিত আছে। রাজমালায় এই স্থানকে 'দৌচাপাথর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দৌচাপাথর সম্পর্কে রাজমালায় বলা হয়েছে যে 'সাধারণত ঃ এই স্থানকে দোয়াপাথর বলে। এই স্থান বর্তমান কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের (Chittagong hill tracts) দীঘিনালা নালা এলাকায় অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। সেকালে এখানে ত্রিপুরেশগণের বিরাম ভবন ছিল। দেবস্থান বলিয়া সকলেই এই স্থানকে পবিত্র মনে করিত এবং প্রতি বৎসর অসংখ্য বলিদ্বারা দেবতার অর্চনা করা হইত। এখানে নরবলিও অনেক হইয়াছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সকল দেবালয়েই নরবলির সংখ্যা কমাইয়া দিয়া ছিলেন। তখন নিয়ম করা হয় শত্রু পাইলে তাহাদের দুইজনকে এই স্থানে বলি দেওয়া হইবে।"(কালীপ্রসন্ন সেন ঃ রাজমালা দ্বিতীয় লহর। ধন্যমাণি-পৃষ্ঠা ২৮৭)।

রাজমালায় উল্লেখ করা আছে যেঃ-

"তিন বৎসর এক নর চতুর্দশদেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।।
দৌচাপাথরের দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীর দুই বলি ঘটে যে সময়।"

(রাজমালা দ্বিতীয় লহর, ধন্যমাণিক্য খণ্ড-পৃষ্ঠা ২৯)

রাজমালায় ধোপাপাথর নামে আর একটি স্থানেরও উল্লেখ করা আছে এবং এই স্থান ও ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানায় অবস্থিত এবং ডাঙ্গর ফার সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে এক পুত্রকে ধোপাপাথরের রাজা করেছিলেন বলে উল্লেখ করা আছে। সুতরাং

শ্রীঅমূল্য কলই প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে যদি ভ্রমবশত: ধোপাপাথরের পরিবর্ত্তে দোয়াপাথর শুনে থাকেন সেজন্য এখানে ধোপাপাথরেরও কিছুটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ধোপাপাথরের পরিচয় প্রসঙ্গে রাজমালায় উল্লেখ করা আছে যেঃ-

কর্ণফুলী নদীর পরপাড়ে আর একটি স্থানের নাম ধোপাপাথর ছিল। মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসনকালে, ত্রিপুরী বাহিনী আরাকান বিজয়ার্থে গমন করিবার পর মগের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎকালে ঃ-

" সেই স্থান ছাড়িয়া আইসে কর্ণফুলী।
মঘসৈন্য পাছে পাছে আসিল সকলি।।
ধোপাপাথরের পথে কর্ণফুলী পার
মঘসৈন্য পাছে পাছে আসে মরিবার।।"

(রাজমালা প্রথম লহর, মধ্যমণি, পৃষ্ঠা -২৫৯)

ডাঙ্গর ফা কর্তৃক তার সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগের সময় এক পুত্রকে ধোপাপাথরের রাজা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজমালায় আছে যে-

"তৈলাইরুঙ্গ স্থলে রাজা হৈল আরজন
ধোপাপাথরেত রাজা আর একজন"

(রাজমালা, ১ম লহর, ডাঙ্গর ফা খণ্ড, রাজ্যবিভাগ, পৃষ্ঠা -২৬)

উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্যগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করলে শ্রীঅমূল্য কলই'র বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়। বর্ত্তমানেও কলইরা দক্ষিণ ত্রিপুরাতেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় বসবাস করে এবং কলই রায়গণের (প্রধানদের) যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতেও দেখা গিয়েছে প্রথমদিকের কলই রায়গণের অধিকাংশই উদয়পুরের ছাইমানরুয়া,এরামবাড়ী, খুম্পুইলং, তেন্তৈখড়, প্রভৃতি এলাকার ছিলেন। বর্ত্তমানে অম্পি, তৈদু, বৈশ্যমুণিপাড়া প্রভৃতি এলাকায় যে সমস্ত কলই পরিবার আছে তাদেরও অধিকাংশই উদয়পুর থেকে এই সমস্ত স্থানে এসেছেন। সুতরাং এই সমস্ত দিক বিচার করলে বোঝা যায় যে কলইদের সাতটি শাখার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একটি শাখা ত্রিপুরার দক্ষিণঞ্চলের কোন স্থান থেকেই ত্রিপুরায় এসেছে। ত্রিপুরা সংক্রান্ত প্রাচীন পুস্তকাদিতে কলই নামে পৃথক কোন উপজাতি গোষ্ঠীর নামের অস্তিত্ব না পাওয়ার ফলে অনুমান করা যায় যে, তাঁরা বাইরের কোন স্থান থেকে আসলেও সে সময় তাঁরা কলই নামে পরিচিত ছিলেন না পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরায় আসার পর তাঁরা কলই নামে পরিচিত হয়েছেন।

কলই ও হালামের পরিচয় প্রসঙ্গে

কলইগণকে কৈলাস সিংহের রাজমালায় হালাম সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ দফার অন্তর্ভূক্ত ষষ্ঠ সংখ্যক দফা হিসাবে দেখানো হয়েছে। হালামগণ সম্পর্কে কৈলাস সিংহের রাজমালায় আছে যে 'হালামগণ প্রধানতঃ ত্রয়োদশ দফায় বিভক্ত। যথা ঃ [১] রাংখল, [২] কাইপেং [৩] মরশুম, [৪] রূপিনী [৫] দাপ্ [৬] কলই [৭] খুলুং [৮] চড়াই [৯] মছবাং [১০] সঙ্গাই [১১] বংশেল [১২] কর্ব্বং [১৩] ফুতিলাংলা"

১৩৪০ ত্রিং (১৯৪০ ইং) এর সেন্সাস বিবরণীতে হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত যে অষ্টাদশ [১৮] দফা দেখানো হয়েছে তাতে কলইদের স্থান সর্বপ্রথম। উপরোক্ত সেন্সাস বিবরণীতে নিম্নলিখিত দফাগুলিকে হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১। কলই, ২। কুলু বা খুলুং ৩। কর্ব্বং ৪। কাইপেং ৫। কৈরোং ৬। চড়াই ৭। ছাইমাল ৮। গব ৯। থাংচেপ ১০। সাকচেপ ১১। নবীন ১২। বংশেল, ১৩। মরছুম ১৪। মূড়াঢাকাং বা মুড়াসিং ১৫। রাংখল ১৬। রূপিনী ১৭। লাঙ্গই ১৮। লাংলুং

কলই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী নামক বইয়ে ও কলইগণকে হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ১২টি দফার একটি হিসাবে বলা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত অভিমতগুলি গ্রহণ করলে কলইগণকে হালাম সম্প্রদায়ের একটি দফা হিসেবে গ্রহন করতে হবে। কিন্তু কলইগণকে হালাম হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে হালাম সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

হালাম সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে ত্রিপুরার সমগ্র অঞ্চল পূর্ব্বে কিরাত বা কুকি অধিকৃত ছিল। ত্রিপুরার রাজমালা নামক গ্রন্থে ও এর সমর্থন আছে। ত্রিপুরার রাজা কিরাতগণকে পরাজিত করে নিজ রাজ্যপাট বিস্তার করেন। সুতরাং এদিক থেকে দেখা যায় যে ত্রিপুরার মূল বা আদি সম্প্রদায় ছিল দুটি- একটি ত্রিপুরী এবং অপরটি হল কিরাত। আর বিভিন্ন যে সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় তারা প্রকারান্তরে এদুটি জাতি বা সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায় বা উপজাতি এবং পরবর্ত্তীকালে এই কুকীদেরই একটি বিরাট অংশ হালাম হিসেবে পরিচিত হল।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে কুকীরাই যদি ত্রিপুরার আদিবাসী হয়ে থাকে এবং হালাম ও কুকিরা যদি অভিন্ন হয়ে থাকে তবে কুকি অপেক্ষা হালাম নামের প্রাধান্য কেন ? এখানে বলা যেতে পারে যে ত্রিপুরার রাজাগণ যে সকল কুকি

রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং যাঁরা ত্রিপুরার রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন কেবল তাদেরকেই অন্যান্য কুকিদের থেকে পৃথক করার জন্য হালাম শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজাগণের সঙ্গে যুদ্ধে যেসব কুকি অপরাজিত ছিল বা ত্রিপুরার রাজার বশ্যতা স্বীকার করেনি কেবল তারাই কুকি নামে পরিচিত ছিল। একই সম্প্রদারের দুটি পৃথক নামের সন্ধান ত্রিপুরার পার্শ্ববর্ত্তী মিজোরামেও দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী মিজোগণ লুসাই নামে পরিচিত, আবার মিজোরামে বসবাসকারী মিজোগণ মিজো নামে পরিচিত। ত্রিপুরায়ও একই সম্প্রদায়ের দুই নামের পরিচয় কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ত্রিপুরীগণ (দেববর্মাগণ) জমাতিয়াদের নিকট 'গুডপাই" নামে পরিচিত এবং কুকিগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট 'ছিকাম' নামে পরিচিত।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে ত্রিপুরার রাজাগণ তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলের কুকিদের পৃথক পরিচিত হিসাবে হালাম নামে অভিহিত করেন এবং তখন থেকেই কুকির পরিবর্ত্তে হালাম নামটাই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল।

এই হালাম নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন ত্রিপুরীরা ত্রিপুরায় আসার পূর্ব্বে কুকিগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ অভ্যস্থ ছিলেন না এবং যাযাবরদের ন্যায় প্রতিবৎসর একস্থান থেকে অন্যস্থানে (হা =মাটি, লামা =পথ) হা-লামাকে অর্থাৎ মাটির পথকে জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই ত্রিপুরার মহারাজার নিকট তাঁরা হালাম নামে পরিচিত হয়েছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে ত্রিপুরার মহারাজ কর্তৃক পরাজিত কুকিগণ ত্রিপুরীদের কাছ থেকে কৃষিকার্য্য করে জীবিকা নির্ব্বাহের পথকে অনুসরণ করেছিলেন বলে তাঁরা হালাম নামে পরিচিত।

হালামগণ যে কুকি বংশোদ্ভব সে সম্পর্কে ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ ইং) সেন্সাস বিবরণীতে বলা হয়েছে যে "হালামগণ কুকির একটি শাখা। যে সকল কুকি প্রথম্ঃ ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহারাই হালাম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদিগকে মিলা কুকি বলে। ইহারা শিবের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে" (১৩৪০ ত্রিং সেন্সাস বিবরণী পৃষ্ঠা-৪০)। হালামগণ যে কুকি বংশোদ্ভব এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্র দত্তের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশবৎসর নামক গ্রন্থেও উল্লেখ করা আছে যে "হালাম শ্রেণীর পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে মিলাকুকিও বলে। ইহাদের আচার ব্যবহারের সহিত কুকিদের আচার ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য আছে" (ব্রজেন্দ্র দত্ত ঃ ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর ও ধর্মনগর বিবরণ পৃষ্ঠা ১২)।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে হালামগণ কুকিদের একটি অংশ বিশেষ এবং হালামরা যদি কুকি বংশোদ্ভব হয় তবে হালাম অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি শাখাকে স্বাভাবিক ভাবেই কুকি বংশোদ্ভব বলে ধরা যেতে পারে।

কলইরা কি হালাম?

পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী কলইগণকে যদি হালাম বলে ধরা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে কলইরা কুকী উপজাতি গোষ্ঠী থেকে এসেছে। পূর্বের উল্লেখিত কয়েকটি বইয়ে কলইগণকে হালাম অন্তর্ভূক্ত বলে দেখানো হলেও শুধুমাত্র কয়েকটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে কলইগণকে হালাম বলে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে পূর্বের উল্লেখিত বইগুলি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন এবং কলইদের সঙ্গে কুকিদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত কতটুকু সামঞ্জস্য আছে সে সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত ঃ কৈলাস সিংহের রাজমালা নামক গ্রন্থে কলইগণকে হালাম সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ (১৩) দফার ষষ্ঠ (৬নং) সংখ্যক দফা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

পরে ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ ইং) সেন্সাস বিবরণীতে কলইগণকে হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অষ্টাদশ (১৮) দফার প্রথম সংখ্যক দফা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

অনেক বইয়ে আবার হালামদের বারটি (১২) দফার উল্লেখ আছে। এব্যাপারে 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশবৎসর (ধর্মনগর বিভাগ) নামক বইয়েও হালামদের বারটি দফার কথা বলা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে "পার্ব্বত্য প্রজাগণের মধ্যে হালাম শ্রেণীর প্রজার সংখ্যাই ধর্মনগর বিভাগে অধিক। হালাম সম্প্রদায় প্রধানত ঃ বার শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার লোক আছে। ১২৮৯ বাংলা সনের জ্যৈষ্ঠমাসে 'প্রকাশিত সমালোচনা ও মীমাংসা' গ্রন্থে ইহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। গোমতী নদীর উত্তর ও বর্ত্তমানে ধর্মনগর বিভাগের পাশ্ববর্তী লঙ্গাই নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশেই তখন ইহারা সাধারণত অবস্থান করিত। ইহাদিগকে ১২ (বার) 'খিল' হালামও বলে"। (ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর, ধর্মনগর বিভাগ-পৃষ্ঠা-১১: ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ১৪৪০ ত্রিং)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হালাম অন্তর্ভূক্ত শাখাগুলির সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ব্বের উল্লখিত বইগুলিতে কোন একটি সুনির্দিষ্ট অভিমত নেই। বিভিন্ন বইয়ে হালামদের বিভিন্ন সংখ্যা দেখানোর ফলে কখনও হালাম অন্তর্ভূক্ত শাখাগুলির সংখ্যা বেড়েছে আবার কখনও

কমেছে। এখন কোন সংখ্যাটি ভ্রান্ত এবং কোন সংখ্যাটি অভ্রান্ত তা স্থির করা খুবই কঠিন এবং তাও বোধহয় পূর্বের লেখকগণের স্পষ্ট ধারণার অভাবের ফল।

এছাড়া ১৩৪০ ত্রিং সেন্সাস বিবরণীতে হালাম অন্তর্ভূক্ত শাখাগুলির যে নাম ও সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তাও ত্রুটি মুক্ত নয়। এই সেন্সাস বিবরণীতে 'ছাইমাল' দফাকে হালাম অন্তর্ভূক্ত একটি শাখা হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং পরে আবার স্বীকার করা হয়েছে যে "বাস্তবিক পক্ষে ইহারা হালাম নহে-কুকি।" কিন্তু সেন্সাসে ইহাদিগকে হালাম বলে গন্য করা হয়েছে।

উপরোক্ত সেন্সাস বিবরণীতে মুড়াসিং সম্প্রদায়কেও প্রথমে হালাম বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পরে বলা হয়েছে যে "ইহারা নোয়াতিয়া কিন্তু সেন্সাসে হালাম বলিয়া গণ্য করা হয়েছে" (১৩৪০ ত্রিং সেন্সাস বিবরণী পৃষ্ঠা-৮১)।

তাছাড়া বিভিন্ন বইয়ে হালাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানোর ব্যাপারেও কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। কৈলাস সিংহের রাজমালায় রাংখলকে দেখানো হয়েছে প্রথম সংখ্যক শাখা হিসাবে। আবার ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণীতে কলইগণকে প্রথম সংখ্যক শাখা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে 'হসম' ভোজন বা অন্য কোন ব্যাপারে রাজদরবারে হালাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাগুলিকে যখন ডাকা হত তখন প্রত্যেক দফার জন্য আসন নির্দিষ্ট করা ছিল। মরছুম সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম সংখ্যক আসন এবং কলই রায়ের (প্রধানের) জন্য চতুর্থ সংখ্যক আসনটি নির্দিষ্ট করা ছিল বলে জানা গিয়েছে। সুতরাং হালামগণের যে তালিকা বিভিন্ন বইয়ে উল্লেখ করা আছে তা অভ্রান্ত বলা যায় না।

তদুপরি মহারাজাদের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ, যেমন রাজার প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রকাশ করা বা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রভৃতি কারণেও অনেক সময় বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করা হত। ত্রিপুরার ইতিহাসে দেখা যায় যে মহারাজাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য রিযাং সম্প্রদায়কে ত্রিপুরার ক্ষত্রিয় অন্তর্ভূক্ত একটি শাখা হিসাবে ধরা হয়েছিল। সুতরাং কলই গণকে হালাম অর্ন্তভূক্ত একটি শাখা হিসাবে বলার পেছনে তৎকালীন শাসকদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা তাও চিন্তা করা প্রয়োজন। এব্যাপারে কলইগণকে হালাম বলে গ্রহণ করার পূর্ব্বে কলইদের সঙ্গে কুকিদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক-নিয়ম কানুন প্রভৃতি ব্যাপারে কতটুকু মিল এবং কতটুকু অমিল আছে তাও বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কলইদের ভাষা এবং আচার-আচরণ তাঁদের হালাম (যাকে কুকিদের একটি শাখা হিসাবে বলা হয়েছে) অন্তর্ভূক্তির বিরুদ্ধেই রায় দেয়। হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত যে বিভিন্ন শাখাগুলি দেখানো হয়েছে তাতে একমাত্র 'রূপিনী ' সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য শাখাগুলির সাথে কলইদের ভাষাগত মিল খুব কম বরং ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া প্রভৃতি হালাম বহির্ভূক্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কলইদের ভাষাগত মিল যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে "১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ত্রিপুরার সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালী বাকি এক তৃতীয়াংশ আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে তিপরা, রিয়াঙ, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রূপিনী, কলই, উলছই, মুরাছিঙ -এই আটটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এক অভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এদের দ্বারা কথিত বিভিন্ন ভাষাগুলিকে এরা সচরাচর 'কগবরক' নামে অভিহিত করেন। কগবরক তিব্বত-বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠির বোড়ো শাখার অন্তর্গত। (সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ ঃ পৃষ্ঠা-১)

নিম্নে প্রদত্ত শব্দতালিকা থেকে ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগে ত্রিপুরীদের সঙ্গে কলইদের কতটুকু মিল এবং হালাম অন্তর্ভূক্ত মরশুম, কাইপেং, এদের সঙ্গে কলইদের কতটুকু গড়মিল তা বুঝতে সহজ হবে।

English	Tripuri	Kalai	Kuki	Morsum	Kipeng
Air	Now-ba	Nakbar	Hli	Thairtyi	Thaiwa
Ant	Musurrum	Muisram	Mirrick	Singmar	Singmar
Bird	Toksa	Tao	Saba	Arpuin	Wa
Boat	Rung	Rung	Loung	Molong	Long
Cow	Mussuk	Mussuk	Jaw'pe	Sarat	Sarat
Fire	Har	Har	Mui	Mui	Mui
Fish	A	A	Nga	Ewga	Nga
Leaf	Blai	Blai/ Bullai	Hua	Anum	Abuia
Mother	Ama	Ama	Anu	Kunu	Kunu
Tiger	Mosa	Mosa	Suk-Kai	Kui	AKui
Good	Kaham	Kaham	Ata	Atha	Adha

Night	Har	Har	Fama	Mui	Gen
Bad	Hamia	Hamia	Lia	Themak	Sanjaku
Where	Bura	Bura/Bra	Ko-Yo	Kthukuma	Tanma
Now	Tabok	Tabo	To-a-na	Atum	Athum

দ্বিতীয়ত ঃ সাধারণত ঃ কুকি সম্প্রদায়ের লোকগণ অধিকাংশই উত্তর ত্রিপুরাতে বসবাস করেন কিন্তু কলইগণ প্রধানত দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেই প্রথম থেকে বসবাস করে আসছেন এবং উত্তর ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে স্বল্প সংখ্যক এই সম্প্রদায়ের লোক বাস করছেন তারা ও দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা থেকেই গিয়েছেন। সুতরাং ভৌগলিক পরিবেশও কলই ও কুকিদের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তির মতকে সমর্থন করে না। এছাড়া কুকিদের মত কলইরা পাহাড়ের উঁচু টিলাগুলিতে সাধারণত বসবাস করে না। তাঁরা ত্রিপুরীদের মত অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতেই বসবাস করেন।

কলইদের গান-বাজনার সঙ্গে কুকিদের গান-বাজনার বিশেষ কোন মিল নেই। এ ব্যাপারে সুরে কিছুটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে ত্রিপুরীদের ও মরশুমদের কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত ঃ- হালাম অন্তর্ভূক্ত সবগুলি শাখাই যদি কুকি-বংশোদ্ভব হত তাহলে তাঁদের বিভিন্ন শাখাগুলির পৃথক পৃথক নাম না থেকে শুধু হালাম বলেই পরিচিত হত। এ ব্যাপারে অনেকে মনে করেন যে কুকিদের আক্রমনের হাত থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরার রাজাগণ যে সমস্ত উপজাতি-গোষ্ঠীগুলিকে ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকার নিয়োগ করেছিলেন তাদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য তৎকালীন মহারাজাগণ 'হালাম' সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। তাদের মতে হালাম শব্দটি এসেছে ককবরক শব্দ 'হাব' এবং 'লামা' থেকে। 'হাব' শব্দের অর্থ হল প্রবেশ করা, এবং 'লামা' শব্দের অর্থ হল পথ। সুতরাং তাদের মতে কুকিরা যাতে ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য মহারাজগণ যে সকল উপজাতি-গোষ্ঠীকে ত্রিপুরার সীমান্তে নিয়োগ করেছিলেন তারাই হালাম নামে পরিচিত হয়েছে। সুতরাং কলইরা কুকি-বংশোদ্ভব না হলেও ত্রিপুরার সঙ্গে কুকি দেশের সীমান্তে সৈন্যবাহিনীতে কাজ করায় তারাও হালাম নামে পরিচিত হয়েছে।

চতুর্থত ঃ কলইদের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং তাঁদের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কলইদের সঙ্গে হালাম অন্তর্ভূক্ত শাখাগুলি যেমন; কাইপেং, বংশেল প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সামাজিক বিবাহ খুব কম হয়। অবশ্য হালাম

অন্তর্ভূক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মরশুমের সঙ্গে কলইদের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু ত্রিপুরীদের সঙ্গে কলইদের বিবাহে সামাজিক কোন বাধা নেই এবং তাদের সঙ্গে কলইদের বৈবাহিক সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তাছাড়া কলইদের পূজা-পার্বণ ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে হালাম অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য শাখাগুলি অপেক্ষা ত্রিপুরীদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কলইদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাচীন রূপকথা, প্রবাদ, ধাঁধাঁ ইত্যাদির সঙ্গেও ত্রিপুরীদের যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়।

কলইরা হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা, সে বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের 'উদয়পুর বিবরণী' নামক গ্রন্থটির প্রতি বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে তাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, লেখক উদয়পুরের বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তার দৃষ্টিতে যারা হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত তাদেরকে 'হালাম' বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন মরশুম উপজাতি, গোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন "মরছুমগণ হালাম দফার অন্তর্ভূক্ত। ইহারা কুকী ভাষাও বুঝিতে পারে। মরছুমগণ কুকীর 'মা বাপ' বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে (৫০ পৃষ্ঠা)।

কাইপেং সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "উদয়পুর বিভাগে ছন গাঙের উজানে ও তৈদু, জাম্বু অঞ্চলে ইহাদের বাস আছে। ইহারা হালাম শ্রেণীর অন্তর্গত এক প্রকার কুকী বলিয়া পরিচিত" (৫৩ পৃষ্ঠা)।

বেথু, রূপিণী, রাংখল, বংশী প্রভৃতি দফা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "ইহারা কুকী এবং হালামদেরই অনুরূপ। অতত্রব ইহাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলিবার নাই" (৫৪ পৃষ্ঠা)।

পক্ষান্তরে, কলই সম্প্রদায় বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি হালাম শব্দটি প্রয়োগ করেন নি। তা থেকে এই ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, লেখকের পক্ষে কলইগণকে হালাম বলে মেনে নিতে সংশয় ছিল নতুবা কলইদের বর্ণনা দিতে গিয়ে হালাম শব্দটির প্রয়োগই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কলইদের সম্পর্কে শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের প্রদত্ত বর্ণনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "ছনগাঙ অঞ্চলে কলইদিগের কয়েকটি পাড়া আছে। পূর্বে শিংলুং ও তুলসীমুড়া প্রভৃতি স্থানে কলইগণ বাস করিত। পার্বত্য প্রজাগণ বাঙ্গালী মুসলমান শ্রেণীর প্রজাদের সংশ্রব

পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ দূরে পর্ব্বতাভ্যন্তরে চলিয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে ও রায়, কাঞ্চন, গালিম, গাবুর প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট দলপতি নির্বাচন প্রথামত নিযুক্ত হইয়া থাকে। রাজধানীতে ইহাদেরও মিছিপ আছে। এই সম্প্রদায়ের রায়ের তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকার হইতে প্রদত্ত মোহর ও অন্যান্য জিনিষ আছে।"

কলইদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে তাঁরা ত্রিপুরার মূল আদিবাসী মরছুমদের একটি শাখা। সুতরাং তাঁরা হালাম অন্তর্ভূক্ত। মরছুম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, কলইরা পূর্বে মরছুম ভাষায়ই কথা বলতেন। এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁরা ত্রিপুরীদের অনুকরণ করতে শুরু করেন। বর্তমানেও কলইগণ আত্মবিস্মৃত হলেও তাঁদের অনেক শব্দের উচ্চারণ মরছুমদের অনুরূপ। মরছুমদের গানের সুরের সঙ্গে কলইদের প্রাচীন গানগুলির সুরের যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া মরছুমগণের সঙ্গে কলইদের বৈবাহিক সম্পর্কের যথেষ্ট নিদর্শণ আছে এবং কলইদের মধ্যে মরছুমদের ভাষা শিখার একটা অলিখিত নিয়ম ও নাকি পূর্বে ছিল। তদুপরি ত্রিপুরার সর্বত্র কলই সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামগুলির পাশেই মরছুম গ্রামগুলি দেখতে পাওয়া যায়। সর্বোপরি কলইগণ মরছুমদের মত নিজেদেরকে হালাম বলে পরিচয় দেওয়ায় মরছুমদের সঙ্গে তাঁদের একটা ভাবগত ঐক্যও দেখা দিয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে কলইদের সঙ্গে মরছুমদের সামগ্রিকভাবে না হলেও যে কিছুটা রক্তের সম্পর্ক আছে তা অনস্বীকার্য্য।

এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে যদিও কলইগণ সমষ্টিগতভাবে কুকী বংশোদ্ভব নয়, তথাপি তাদের সঙ্গে কুকীদের যে রক্তের সম্পর্ক কিছুটা আছে তা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। কলইদের ভিতরগত সাতটি শাখার মধ্যে 'আবেল' শাখার কলইগণ বিশেষভাবে কুকীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। এই শাখার কলইগণ অমরপুর মহকুমার তৈদুবাড়ী এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যায় বাস করে। 'The Kukis of Tripura' বইয়ে আবেল হদার শ্রীপর্বমুনি কলই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "It is said that Sri Parbamoni koloi of Taidu Bazar of Amarpur Sub-Division, South Tripura was originally a kuki. But his forefathers lived in a koloi village and gradually their descendants have become koloi group of the Halam community and now they are known as kolois." [The kokis of Tripura"-Ram Gopal Singh.]

কলইদের সঙ্গে রিয়াং জনগোষ্ঠীরও সংমিশ্রন কিছুটা হয়েছে বলে জানা

গিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আসার ব্যাপারে এমনিতে কলইদের সঙ্গে রিয়াংদের যথেষ্ট মিল আছে। তাছাড়া রিয়াংদের ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে কলইদের ওয়াকবুর হদার বেশ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীতে আছে যে রিয়াংগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের 'কাচকক্' নামে এক রাজার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাদের পক্ষ থেকে তুইলংহা, তুইক্লুহা, দুমসহা, পাইমসহা, ইয়াংসিকা ও পাইসিকা- এই ছয়জন তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের দরবারে নালিশ জানাতে এসেছিল। তৎকালে রাস্তাঘাট অত্যন্ত দুর্গম থাকায় তারা একটি ভেলায় (বুর) করে দেবতামুড়া হয়ে গোবিন্দ মাণিক্যের রাজধানীতে এসেছিল।

উপরোক্ত কাহিনীর সঙ্গে কলইদের ওয়াকবুর (উাকবুর) নামক দফাটির নামের উৎপত্তির ইতিহাসের যথেষ্ট মিল আছে। কলই সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে উাকবুর শব্দটি উা = বাঁশ এবং বুর = ভেলা শব্দ থেকে এসেছে, তারা বলেছেন যে এই শাখার লোকগণ বাঁশের ভেলা চালাতে ভালবাসেন বা তারা বাঁশের ভেলা চড়ে ত্রিপুরায় এসেছিলেন বলে তাদের নাম হয়েছে ওয়াকবুর (উাকবুর)। সুতরাং এদিক থেকে চিন্তা করলে কলইদের সঙ্গে রিয়াংদের একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

তাছাড়া ধর্মীয় আচার আচরণ, সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের দিক থেকেও কলইদের সঙ্গে রিয়াংদের যথেষ্ট মিল আছে।

বর্তমানে কোন জাতি বা উপজাতিকে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতি বা উপজাতি থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। পূর্বে প্রায়ই বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য (জুমচাষের জন্য ভূমিদখল) ও নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। এই সংঘর্ষে পরাজিত গোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত যে বিজিত গোষ্ঠী বা অধিকতর শক্তিশালী গোষ্ঠীর অধীনে যেত, সেই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। এভাবে পূর্বে বিভিন্ন উপজাতি-গোষ্ঠী তাদের নাম পরিবর্তন করত।

তাছাড়া বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে ও একটি উপজাতি গোষ্ঠীর লোক অন্য একটি উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। সুতরাং কলই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে হালাম অন্তর্ভুক্ত ও হালাম বহির্ভূক্ত বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে সে

ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। এমন কি কলইদের সঙ্গে অ-উপজাতি গোষ্ঠীরও কিছুটা সংমিশ্রণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অমরপুর মহকুমার যন্ত্রনাপাড়া গ্রামের শ্রীহরেন্দ্র কলই বলেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ একজন সাহা সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি কলই সম্প্রদায়ের এক রমণীকে বিয়ে করে ঐ গ্রামেই থেকে যান। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ কলই উপাদি ধারণ করেই যন্ত্রনাপাড়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছেন। শ্রীহরেন্দ্র কলইর ছেলে শ্রীহরিদাস কলইর কাছ থেকে তাদের বংশ-তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তা নীচে দেওয়া হল-

১। সুদেব রায় (সাহা)
↓
২। ইন্দ্রজিত কলই
↓
৩। সুবল কলই
↓
৪। সদেব কলই
↓
৫। গণেশরাম কলই
↓
৬। গগনচন্দ্র কলই
↓
৭। হিনন্দ্র সীতারাম কলই ঈশানন্দ কলই মদন সুকৃতি

৮। মনুবায় কলই নগেন্দ্র কলই হরেন্দ্র কলই বল্লিকুমার কলই

৯। নবদ্বীপ কলই অধীনীকুমার কলই হরিদাস কলই

এছাড়া কলই সমাজে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে যে অন্য উপজাতি গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি যদি কলই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সে অচাইর (পুরোহিত) মাধ্যমে কিছু আচার অনুষ্ঠান করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রায়ের অনুমতিক্রমে কলই সমাজে প্রবেশ করতে পারে এবং কলই উপাধি ধারণ করতে পারে। অমরপুর মহকুমার অম্পির পার্শ্ববর্ত্তী মজুমদার বাড়ী গ্রামে একটি মরশুম পরিবার আছে এবং এই পরিবারের ছেলে মেয়েরা কলই সমাজের সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলে।

তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী

থেকে কলই সমাজে প্রবেশ করলে তাঁরা প্রত্যেকেই এখানে সমান মর্য্যাদা ও অধিকারে ভোগ করে থাকেন। এমন কি কলই সম্প্রদায়ের বর্তমান রায় শ্রীকামিনী কলই ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সুতরাং সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান কলই সম্প্রদায় ত্রিপুরী, কুকি, মরছুম, রিয়াং প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ।

কলইগন মঙ্গোলীয় জাতি-গোষ্ঠীর হলেও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শাখার লোকদের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেহের বর্ণ, দৈহিক উচ্চতা, আকৃতি প্রভৃতি ব্যাপারে যে পার্থক্য দেখা যায় তাও তাদের ভেতরে যে বিভিন্ন উপজাতি-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে তারই পক্ষে রায় দেয়। ফলে কলইরা ত্রিপুরী ভাষার কথা বললেও তাদের কিছু অংশের প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে এখনও সময় সময় অনেক হালাম শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

কলই সম্প্রদায় অধ্যুষিত দু'টি আধুনিক গ্রাম ও কয়েকটি প্রাচীণ গ্রামের পরিচয়

।। যন্ত্রণাপাড়া ।।

এই গ্রামটি অমরপুর মহকুমার অম্পিনগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়েছে সেই রাস্তার পশ্চিমপ্রান্তে প্রবাহিত ধনলেখা ছড়ার পশ্চিমেই এই কলই উপজাতি অধ্যুষিত যন্ত্রণাপাড়া গ্রামটি। এই গ্রামের পূর্বদিকেই ধনলেখা ছড়া (এই ছড়া এই গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে অম্পিনগরের কাছেই ডলগাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছে) এবং ছড়ার পূর্ব প্রান্ত দিয়েই তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তাটি চলে গিয়েছে। এই গ্রামে প্রবেশ করতে হলে ধনলেখা ছড়া অতিক্রম করতেই হবে এবং এই ছড়ায় কোন পুল না থাকায় গ্রামের অধিবাসীদেরকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই গ্রামটি দেখতে একটি দ্বীপের মত। এই গ্রামটি তেলিয়ামুড়া থেকে প্রায় ২৩ (তেইশ) কিঃমিঃ দক্ষিণে ও অমরপুর থেকে প্রায় ২৫ (পঁচিশ) কিঃ মিঃ উত্তরে অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া, অমরপুর রাস্তায় প্রায় মধ্যস্থলেই যন্ত্রণাপাড়া অবস্থিত।

অনুসন্ধানের পর জানা গিয়েছে যে, যন্ত্রণাপাড়া গ্রামের পূর্ব নাম ছিল ধনলেখা।

বর্ত্তমানে এই গ্রামের উত্তরদিকে ধনলেখা নামে আর একটি কলই গ্রাম আছে। যন্ত্রণাপাড়া গ্রামের পূর্বদিকের প্রবাহিত ছড়ার নামও ধনলেখা ছড়া কিন্তু পরবর্ত্তীকালে (৩৫/৪০ বৎসর হবে) এই গ্রামেরই যন্ত্রণাকলই নামে একজন অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির নামানুসারে এই পাড়ার নাম করা হয় যন্ত্রণাপাড়া। উপরোক্ত যন্ত্রণা কলইর ছেলে শ্রীব্রজেন্দ্র কলই বর্ত্তমানে বৈশ্যমুনি পাড়া গাঁওসভার গ্রাম প্রধান। যন্ত্রণা কলইর পিতা খুচিরাম কলই ছিলেন কলইদের রায় (অর্থাৎ তাদের সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি)। যন্ত্রণা কলইর বংশ পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল-

খুচিরাম কলই (কলইদের বুকাং হদার ১১নং রায়)

↓

যন্ত্রনা কলই

শ্রীব্রজেন্দ্র কলই | শ্রীদীনদয়াল কলই।

(বর্ত্তমান বৈশ্যমুনি পাড়ার গাঁওপ্রধান)

এই গ্রামটিতে মোট ২৪টি পরিবার আছে এবং এর জনসংখ্যা প্রায় ১৮১ জন। এর মধ্যে ৯১ জন পুরুষ ও ৯০ জন স্ত্রীলোক। এই গ্রামের মোট ২৪টি পরিবারের মধ্যে ২২টি পরিবারই কলই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত এবং বাকী দুইটি পরিবারের মধ্যে একটি দেববর্মা পরিবার ও একটি বাঙ্গালী পরিবার আছে। উপরোক্ত দুইটি পরিবারও কলইদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর এই গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে।

এই গ্রামের সবাই কৃষিকার্য্যের সংগে যুক্ত এই কৃষিকার্য্যই তাদের জীবিকার প্রধান উপায় গ্রামের প্রত্যেকেরই নূন্যতমপক্ষে ২/৩ কাণি করে কৃষি জমি আছে। খবর নিয়ে জানা গিয়েছে যে, মাত্র ১টি পরিবারের বাড়ীর জায়গা ছাড়া কোন কৃষি জমি নেই। এই গ্রামের শ্রীনীলমণি কলই যন্ত্রণাপাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধানের জমির মালিক। সমতল ভূমি ছাড়াও এই গ্রামের অনেকেই জুম চাষও করে থাকে।

কৃষিকার্য্য ছাড়া এই গ্রামের অনেকে বন বিভাগের বিভিন্ন কাজ করেও কিছুটা আয় করে থাকে। এই গ্রামের প্রত্যেক ঘরেই তাঁত আছে। এই তাঁতের মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব ব্যবহারের কাপড় তৈরী করে। তাদের তৈরী কাপড়গুলি দেখতে সুন্দর ও খুব মজবুত।

এই গ্রামের লোকদের মধ্যে ব্যবসার প্রবণতা নেই বললেই বললেই চলে। কিছুদিন হয় এখানে কলই সম্প্রদায়েরই দুইজন ব্যক্তি একটি মুদীর দোকান ও একটি চায়ের দোকান দিয়েছেন। দোকানগুলির অবস্থা মোটামুটি ভাল।

এই গ্রামে কলই সম্প্রদায়ের ১০ জন সরকারী চাকুরীজীবী আছেন এবং তাদের মধ্যে একজন মহিলা সরকারী কর্মচারীও আছেন। এই সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল। তাদের অনেকেই কৃষিকার্য্যের সঙ্গেও যুক্ত এবং অন্যান্যদের চেয়ে তারা তাদের আয় ব্যয় সম্পর্কে সচেতন থাকায় তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এছাড়াও তাদের অনেকেই আনারস, লেবু, জাম্বুরা বেল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ফল এবং মুলা, আলু, মরিচ, বেগুন, লাউ, ইত্যাদি তরকারী পার্শ্ববর্ত্তী অম্পি বাজারে বিক্রয় করে কিছুটা উপার্জন করে থাকেন।

এই গ্রামের অধিকাংশ ঘরের মাটির দেওয়াল এবং ছনের চাল। তাছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি টিনের ঘরও আছে। অনেক বাড়ীতেই কাঠের আধুনিক আসবাবপত্র আছে।

এই গ্রামে একটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় ও একটি Social Education Centre আছে এবং গ্রামের জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে। যন্ত্রণাপাড়া Social Education Centre-টি ১৯৬২ ইং-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর ছাত্রসংখ্যা ও সন্তোষজনক।

এই Social Education Centre থেকে পড়া শেষ করে ছেলে-মেয়েরা এই গ্রামেই অবস্থিত নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। এই বিদ্যালয়ে কলই সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যাই সর্বাধিক এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার কিছু সংখ্যক অ-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীও এখানে পড়ে। বিদ্যালয়টির সুন্দর পরিবেশ, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও এই গ্রামের জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ও শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত। গত দুই বৎসর ধরে এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী পার্শ্ববর্ত্তী অম্পি হাইস্কুলে মোটামুটি ভালই ফল করতে পেরেছে। খেলাধূলা, বাগান করা প্রভৃতি ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের যে যথেষ্ট আগ্রহ তা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেই অনুভব করা যায়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গত পাঁচ বৎসরের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০
১। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	৭০	৭৬	৮৭	১০৯	১৪৭	১৮০

২। মোট ছাত্র সংখ্যা	৪০	৪৬	৪৯	৭০	৯১	১০০
৩। মোট ছাত্রী সংখ্যা	৩০	৩০	৩৮	৩৯	৫৬	৮০
৪। উপজাতি ছাত্র সংখ্যা	১৫	২৭	২৫	৭	৬০	৬৫
৫। উপজাতি ছাত্রী সংখ্যা	১২	১৬	১৯	৩৯	২৫	৫০
৬। মোট উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	২৭	৪৩	৪৪	৪৬	৮৫	১১৫
৭। মোট অ-উপজাতি ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা	৪৩	৩৩	৪৩	৬৩	৬২	৬৫

১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সালে এই নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী অম্পি হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে তাও আশাপ্রদ। ১৯৭৯ সালে উপজাতি ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও ১৯৮০ সালে উপজাতি ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ত্রিপুরার অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত যন্ত্রণাপাড়া নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়েও প্রতি বৎসর অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সরস্বতী পূজা, নেতাজীর জন্মদিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। এই বিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা করে থাকে তা ত্রিপুরার কোন শহর এলাকা থেকে কোন অংশে কম নয়। এ ব্যাপারে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ও ঐ গ্রামের জনসাধারণ যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন।

এই গ্রামের সবাই হিন্দুধর্মাবলম্বী, শুধুমাত্র একজন খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই গ্রামের কলই সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিরা তাদের চিরাচরিত কেরপূজা, গড়িয়াপূজা, লাম্প্রাওয়াথপ্, নয়াখাওয়া প্রভৃতি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্মী পূজা, শনি পূজা, কালী পূজা প্রভৃতি বিভিন্ন সর্ব্বভারতীয় পূজা-পার্বণের এক সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছেন। এই গ্রামে দুই ঘর ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ও দুইঘর স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য আছেন। গ্রামের বৃদ্ধলোকেরা অনেকেই রামায়ণ মহাভারত

পড়তে পারেন এবং ধর্ম-শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞানও আছে। কিছুদিন হয় ঐ গ্রামেরই শ্রীগন্ধর্ব কলই বৈষ্ণবদের একটি ছোট আখড়া তৈরী করেছেন। এই গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই পবিত্র তুলসী গাছ ও যথেষ্ট পরিমাণ ফুলের গাছ আছে।

যন্ত্রণাপাড়া গ্রামটি বৈবাহিক সূত্রে বাঙ্গালী , দেববর্মা, মণিপুরী, বিহারী প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিভিন্ন জাতি উপজাতি সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব এই গ্রামে লোকদের যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। এই গ্রামের সকলেই খুব ভাল বাংলা বলতে পারেন এবং অনেকে হিন্দী ও ইংরেজী কিছু কিছু বলতে পারেন। এই গ্রামের অনেক শিল্পী তাদের মাতৃভাষা ছাড়াও ভাল বাংলা ও হিন্দী গান গেয়ে থাকেন।

কলই সম্প্রদায়ের প্রাচীন ব্যক্তিরা যে তাদের বংশ তালিকা রক্ষার ব্যাপারে কতটুকু সচেতন ছিলেন পাঠকদের অবগতির জন্য এবং ভবিষ্যত গবেষকদের কাজে সাহায্যের জন্য নিম্নে যন্ত্রণাপাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং যন্ত্রণাপাড়া বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও প্রেসিডেন্ট হদার শ্রীব্যাসমণি কলই এর বংশাবলী অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল ঃ

শ্রীব্যাসমণি কলই'র বংশাবলী

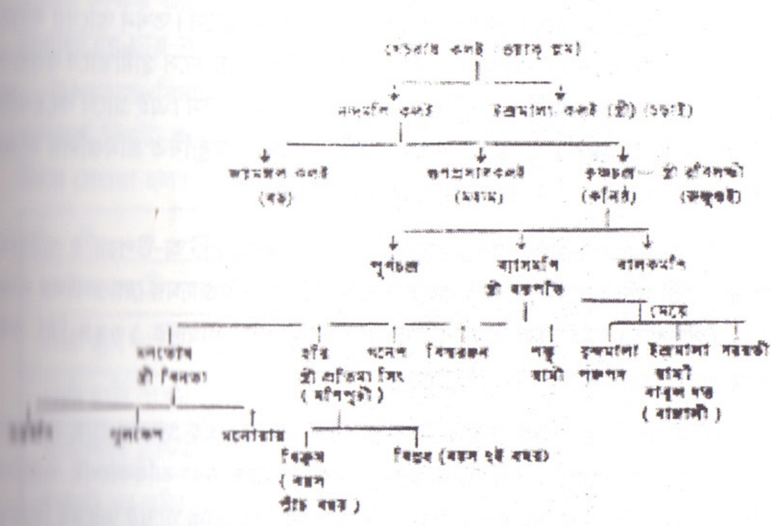

।। বৈশ্যমুনি পাড়া ।।

এই গ্রামটি অমরপুর মহকুমার অম্পি থেকে প্রায় ৪ কিঃমিঃ পশ্চিমে ছনগাঙছড়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। অম্পি থেকে বৈশ্যমুণিপাড়া যেতে এই ছনগাঙছড়ার অতিক্রম করতে হয়। ছনগাঙছড়ার তীরে অবস্থিত বলে পূর্ব্বে এই গ্রামকে ছনগাঙ বাড়ী বলা হত। এই গ্রামের পশ্চিম দিকে 'মেলছি' নামে আর একটি ছড়াও প্রবাহিত বলে পূর্বে এটা মেলছিপাড়া নামেও পরিচিত ছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর হয় এই গ্রামেরই বৈশ্যমুনি কলই নমে একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, যিনি বৈশ্যমুণিপাড়া বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ১০ কাণি জায়গা দান করেছিলেন তার নামে এই পাড়ার নাম হয় বৈশ্যমুণিপাড়া। এই বৈশ্যমুণি কলইর বংশ তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

উদয় চরণ কলই
↓
বৈশ্যমুনি কলই

মিত্র কলই	মর্দন কলই	রাজকুমার কলই	মহামাণিক কলই	ভক্ত কলই	জয়চন্দ্র কলই	ক্ষুদিরাম কলই

এই গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীঅমূল্য কলইর (সর্দার) কাছ থেকে জানা গিয়েছে, এই গ্রামটি পূর্ব্বে ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং এখানকার লোকজন পূর্ব্বে এই পাড়া থেকে প্রায় দুই কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত মন্দার পাড়ায় থাকত। তারা এই গ্রামের পত্তন করেন ১৩২৪ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৪ ইং) ফাল্গুন মাসে। তখন তাদের কলই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই মন্দার পাড়া থেকে এই পাড়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এই গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুবই মনোরম। এই গ্রামে কয়েকটি বড় বড় দীঘি (Lake) আছে। ত্রিপুরার কলই সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে এই গ্রামটিই সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী।

এই পাড়ায় প্রায় ৬৫টি পরিবার বসবাস করে তার মধ্যে ৪টি অ-উপজাতি পরিবার আছে। বাকী পরিবারগুলির সবই কলই সম্প্রদায়ভূক্ত। এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০ (পাঁচশত)। মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ১৩৪৪ ত্রিং এই গ্রামে এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বৈশ্যমুনি পাড়া বেশ স্বচ্ছল। এই গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কমপক্ষে ২/৩ কাণি করে ধানের জমি আছে এবং অধিকাংশই সমতল জমি চাষের সঙ্গে সঙ্গে জুম চাষও করে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই তাদের নিজস্ব

বাঁশ আছে এবং তা দিয়ে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরী করে। মাছের চাষেও এই গ্রামের কিছু সংখ্যক লোকের আয়ের পথ খুলে দিয়েছে। অম্পিনগর বাজারের অধিকাংশ মাছই বৈশ্যমুনি পাড়ার লেইকগুলি থেকে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এই গ্রামের অনেকেই অম্পিবাজারে আলু, বেগুন, করলা, কলা, কচু কুমড়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তরকারী এবং আনারস, কলা, বেল, জাম্বুরা প্রভৃতি বিভিন্ন ফল বিক্রী করেও বেশ আয় করে থাকে।

এই গ্রামে কলই সম্প্রদায়ের বাইশজন (২২) এবং অ-উপজাতি ৪ (চার) জন সরকারী কর্মচারী আছেন। এই সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকতর ভাল। তাছাড়া এই গ্রামেরই শ্রীমদন কলইর একটি চাউলের কল ও অম্পিনগরে একটি সিনেমা হল আছে।

এই গ্রামের অধিকাংশ ঘরই মাটির দেওয়াল ছনের চাল দিয়ে তৈরী কিন্তু টিনের ঘরের সংখ্যাও কম নয়।

শিক্ষার ব্যাপারে এই গ্রামবাসীদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। এই গ্রামে ১টি Social Education Centre ও ১টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়টি [illegible] ইংতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং Social Education Centre টি ১৯৬২ ইংরেজীতে প্রথম নৈশ বিদ্যালয় হিসাবে আরম্ভ হয়েছিল।

উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়টি প্রায় ১০ কানি জমির উপর অবস্থিত। এই বিদ্যালয়ে [illegible] শিক্ষক আছেন যার মধ্যে ৩জনই এই গ্রামের এবং কলই সম্প্রদায়ের এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৪২ জন।

উপরোক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার নিম্নবর্ণিত টেবিলটি বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অনুভব করা যাবে বলে গত পাঁচ বৎসরের একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দেওয়া হল।

	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০
মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	৯৬	১১২	১১০	১২৮	১৩৯	১৪২
মোট ছাত্র সংখ্যা	৬২	৭০	৭৩	৯১	৯৯	১০২
মোট ছাত্রী সংখ্যা	৩৪	৪২	৩৮	৩৭	৪০	৪০
অ উপজাতি ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	১২	৭	৮	৫	৭	১০
উপজাতি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	৮৪	১০৫	১০২	১২৩	১৩২	১৩২

খেলাধূলা শরীরচর্চায় এই বিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম আছে। এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রী রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেছে ও সাফল্য লাভ করেছে। এই বিদ্যালয় থেকে প্রতি বৎসর বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র পার্শ্ববর্তী অম্পি হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়। ত্রিপুরার অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত এখানেও সরস্বতী পূজা, ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী প্রভৃতি দিবসগুলি উৎসাহরে সঙ্গে পালন করা হয়।

এই গ্রামের জনসাধারণ সবাই হিন্দুধর্মাবলম্বী। এবং তারা তাদের চিরাচরিত কেরপূজা, গড়িয়াপূজা, লাম্প্রপূজা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, শনিপূজা প্রভৃতি সর্বভারতীয় পূজাপার্বণও করে থাকে। গ্রামের বৃদ্ধ-লোকদের অনেকেই ভারতের বিভিন্ন হিন্দুতীর্থ ভ্রমণ করেছেন এবং রামায়ণ, মহাভারত গীতা প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এই গ্রামের শ্রীঅমূল্য কলইর বাড়ীতে একটি পূজামণ্ডপ আছে এবং এখানে পূর্ণিমা তিথিতে সময় সময় হরিকীর্ত্তন হয়ে থাকে।

এই গ্রামের সঙ্গে দেববর্মা, বাঙ্গালী প্রভৃতির অন্যান্য জাতি-উপজাতির বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার ফলে এখানে মিশ্র সংস্কৃতির কিছুটা প্রভাব পড়েছে। গ্রামের অনেক ছেলের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ থাকায় শহরের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা বলতে ও বুঝতে পারেন।এই গ্রামের জন-সাধারণের প্রায় ৯৫ কলই সম্প্রদায়ভূক্ত থাকার ফলে এই গ্রামটিকে কলই অধ্যুষিত গ্রাম বলে নিঃসন্দেহে ধরা যেতে পারে।

।। তৈছারাংচাক ।।

কলই সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই সদর মহকুমার গ্রামটি জম্পুইজলা গাঁওসভা ও জম্পুইজলা তহশীলের অন্তর্ভূক্ত। এটা জম্পইজলার দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত। এই গ্রামে ৩০টি পরিবার বাস করে এবং সবই কলই সম্প্রদায়ভূক্ত। কলই সম্প্রদায়ের ওয়াপ্লম হদার লোকই সর্বাধিক এবং কুছু হদার ৩টি পরিবার, ওয়াকপুর হদার ২টি পরিবার এবং আবেল হদার ১টি পরিবার এই গ্রামে বাস করে। চড়াই এবং বুকাং হদার কোন পরিবার এই গ্রামে বাস করে না।

১৯৭৬ ইংরেজীতে এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে এবং এই বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষিকাও ঐ গ্রামেরই আধিবাসী কলই সম্প্রদায়ের শ্রীমতী দয়াবতী কলই। এই গ্রামের কলই সম্প্রদায়ের ৩ জন ছাত্র বর্ত্তমানে কলেজে পড়াশুনা করছে।

এই গ্রামের প্রত্যেকেই কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল এবং জুম চাষের সঙ্গে সঙ্গে তারা সমতল ভূমি চায করে থাকে। এই গ্রামের ৩ জন সরকারী কর্মচারী আছেন। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভাল। এই গ্রামে কোন টিনের ঘর নেই এবং অধিকাংশ বাড়ী মাটির দেওয়াল , ছনের চাল দিয়ে তেরী। এই গ্রামের চৌধুরীর নাম শ্রীগোবিন্দ কলই (ওয়াপ্লমহদার) এবং খান্দল (চৌধুরীর সাহায্যকারী সংবাদ (প্রেরক) হলেন শ্রীরবিমোহন কলই।

।। চাম্পাশর্মা।।

এই গ্রামটি সদরের তৈছারাংচাক গ্রামের অল্প উত্তর পূর্বদিকে সদর মহকুমার সীমানায় উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত। মোট ১২টি পরিবার নিয়ে এই ছোট্ট গ্রামটিতে ৮টি কলই পরিবার ও ৪টি দেববর্মা পরিবার বাস করে। এই গ্রামে কোন স্কুল নেই। কোন সরকারী কর্মচারী নেই, গ্রামের অধিকাংশই অশিক্ষিত। এই গ্রামের সবাই জুম ও সমতলভূমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

।। দারখাই।।

এই গ্রামটি জম্পুইজলা থেকে প্রায় ৪ কিঃমিঃ পূর্বে এবং তৈচারাংচাক গ্রামের ১ কিঃমিঃ উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামটিও সদর মহকুমায় অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় ৫০টি পরিবারের মধ্যে ৪৫টি কলই পরিবার এবং বাকীগুলি দেববর্মা পরিবার। এই গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে, কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তিও আছেন। গ্রামের অধিকাংশই ব্যক্তিই অবস্থাপন্ন, এবং এই গ্রামে বেশ কয়েকটি টিনের ঘর আছে। বর্তমানে চৌধুরীর নাম শ্রীশুক্রপদ কলই। কলইদের শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি শ্রীবিন্দু কলই এই গ্রামেরই অধিবাসী। গ্রামটির মধ্য দিয়ে দারখাই নামে একটি ছড়া প্রবাহিত আছে। অনেকে মনে করেন যে, দারখাই ছড়ার নাম থেকেই এই গ্রামের নাম হয়েছে দারখাই পাড়া।

।। বৈরাগী পাড়া।।

এই গ্রামটি সদর মহকুমার টাকারজলা ও জম্পুইজলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই গ্রামটি খুবই প্রাচীন এবং পূর্বে এটি একটি কলই অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই গ্রাম থেকে অনেক কলই পরিবার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে চলে গিয়েছে। বর্তমানে এই গ্রামে প্রায় ৯টি কলই পরিবার আছে এবং বাকীরা দেববর্মা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামের প্রত্যেকেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কলই

সম্প্রদায়ের কোন ব্যবসায়ী এই গ্রামে নেই। এই গ্রামে একটি প্রাচীন বটগাছ ও একটি আশ্রম আছে। এখানে প্রতি বৎসর রথের মেলা হয়। এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারী আছেন।

।। বাহাত্ত পাড়া।।

এই গ্রামটি সদর মহকুমার টাকারজলার পূর্বদিকে উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত। এই গ্রামটি খুবই প্রাচীন এবং কলই সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন রায়ের (প্রধান) বাড়ী এই গ্রামে ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই গ্রাম থেকে অনেক কলই পরিবার জীবিকার জন্য তেলিয়ামুড়ার ব্রহ্মছড়া ও তৈকৈ গ্রামে চলে যায়। অনেকে বলে থাকেন যে এই গ্রামে পূর্বে ৭২টি কলই পরিবার ছিল বলেই এ গ্রামের নাম হয়েছে বাহাওপাড়া।

বর্ত্তমানে এই গ্রামে মোট ৪৫টি পরিবার আছে এবং এর মধ্যে অল্প কয়েকটি দেববর্মা পরিবার বাদে সবগুলি পরিবারই কলই সম্প্রদায়ভূক্ত। এই গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। এই গ্রামেরও সবাই জুম ও সমতল জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

।। বাটাপাড়া।।

এই গ্রামটি জম্পুইজলার অল্প পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই গ্রামটিতে কলই সম্প্রদায়ভূক্ত লোকরাই সর্বাধিক সংখ্যক বসবাস করত বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কলই পরিবারগুলি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে চলে যায় এবং বর্ত্তমানে এই গ্রামে মোট ৫০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ছয়টি কলই পরিবার বাদে বাকিগুলি বাঙ্গালী পরিবার। এই গ্রামটি বর্ত্তমানে নূতননগর নামে পরিচিত হয়েছে। এই গ্রামে কলই সম্প্রদায়ের কোন সরকারী কর্মচারী নেই। এখানকার কলই পরিবারগুলি ওয়াপ্লম হদার অন্তর্ভূক্ত এবং সবারই অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

।। পল্কু ।।

এই গ্রামটি অমরপুর মহকুমার অম্পিনগর থেকে প্রায় নয় কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমে এবং তৈদু থেকে প্রায় ছয় কিঃমিঃ পশ্চিমে অবস্থিত। তৈদু বাজার থেকে পল্কু পর্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযোগী একটি রাস্তা আছে। এই গ্রামে প্রায় ৪৫টী কলই পরিবার আছে এবং কলই সম্প্রদায়ের ১৯৭৮ সনের নির্বাচিত রায় (প্রধান) শ্রীকামিনী কলই এই গ্রামেরই অধিবাসী। এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে একটি চায়ের দোকান ও একটি মুদি দোকান আছে। এবং এই উভয় দোকানের মালিকই কলই সম্প্রদায়ভূক্ত।

।। জাকসাই পাড়া ।।

এই গ্রামটি অমরপুর মহকুমায় তৈদুবাজার থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিম উত্তর দিকে এবং লক্ষীধন পাড়া থেকে প্রায় দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামটি খুবই প্রাচীন এবং পূর্বে কলই সম্প্রদায়ের লোকরাই এই গ্রামে বাস করত বলে জানা গিয়েছে। এই গ্রামে জলের অসুবিধার জন্য পরবর্তীকালে এখান থেকে অনেক কলই পরিবার যন্ত্রণাপাড়া, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে যন্ত্রণাপাড়া নিবাসী শ্রীব্যাসমুণি কলইর বহুপূর্বে এই গ্রামে বাস ছিল বলে জানা গিয়েছে।

যন্ত্রণাপাড়ার এক বৃদ্ধা কলই জাকসাই পাড়ার নামকরণ সম্পর্কে বলেছেন যে, এই গ্রামটির কক্‌বরক নাম হল জাক্‌সুইয়া (Jakswia) পাড়া। তিনি বলেছেন যে পূর্ব্বে বড়মুড়া অঞ্চল (এরামপাড়া, লুথুর, কোণাবন) থেকে যখন কলইরা এই গ্রামে প্রথমে আসে তখন এখানে জলের খুব অসুবিধা ছিল, এমন কি হাত ধোওয়ার জল পর্যন্ত পাওয়া কষ্টকর ছিল। তাই এই গ্রামের নাম হয়েছে জাকসুইয়া পাড়া। কক্‌বরক শব্দ 'জাক = হাত এবং 'ছুইয়া'=ধোয়া হয়নি। বর্তমানে এই গ্রামটি জাকসাই পাড়া নামেই পরিচিত।

বর্তমানে জাকসাই পাড়া কাইপেং ও কলই সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত একটি মিশ্র গ্রাম। এখানে প্রায় ২৫টি কলই পরিবার ও প্রচুর সমতল কৃষিজমি আছে। এই গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে এবং এখানকার অনেকে ছন-বাঁশ বিক্রি করে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করে।

।। লক্ষীধন পাড়া ।।

তৈদুর প্রায় তিন মাইল পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত। এখানে ১০/১২টি কলই পরিবার বাস করে। এখানে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে।

।। তৈদু ।।

এই গ্রামটি অমরপুর ও খোয়াই মহকুমার সীমানায় অবস্থিত। এটি অমরপুর শহর থেকে প্রায় ৩১ কিঃমিঃ উত্তরে ও তেলিয়ামুড়া শহর থেকে প্রায় ১৭ কিঃমিঃ দক্ষিণে তেলিয়ামুড়া - অমরপুর রাস্তার পাশে অবস্থিত। এখানে একটি বাজার ও একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। এই গ্রামটি কলই ও বাঙ্গালী এই উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ দ্বারা অধ্যুষিত একটি মিশ্র গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় ৩০টি কলই পরিবার আছে। গ্রামের কলইরা লেখাপড়া ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই উন্নত। এখানে খৃষ্টানমণ্ডলী পরিচালিত একটি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই গ্রামে

পাঁচটি খ্রীষ্টান কলই পরিবার আছে এবং তারা পার্শ্ববর্ত্তী কাইপেং বাড়ী গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে। এই গ্রামে একটি কল্যাণ আশ্রম আছে। এই আশ্রমটিতে কাইপেং, কলই, দেববর্মা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু ছাত্র থাকে। শ্রীধীরেন্দ্র কলই এই আশ্রমের সংগঠক।

।। ধনলেখা ।।

এটি অম্পি থেকে প্রায় ৩ কিঃমিঃ উত্তরে ধনলেখা ছড়ার পাশে অবস্থিত। এখানে ২৫টি কলই পরিবার আছে। কলই সমাজের গাবুর পদাধিকারী ব্যক্তি শ্রীতরণী কলই এই গ্রামেই বাস করেন। এখানে মহারাজার আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। এই গ্রামে প্রচুর সমতল শস্যক্ষেত্র আছে এবং এখানকার সবাই কৃষিজীবী।

।। ছেরথুম পাড়া ।।

অম্পি থেকে প্রায় ৬ কিঃমিঃ দক্ষিণে, দক্ষিণ ছনগাঙ গাঁওসভার অধীনে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এটা কলই ও রিয়াং অধ্যুষিত একটি মিশ্রগ্রাম। এই গ্রামে ৯টি কলই পরিবার আছে।

।। তৈছাং ।।

অম্পিনগর থেকে প্রায় ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে, অম্পিনগর গাঁওসভার অধীনে এই গ্রামটি কলই ও বাঙ্গালী অধ্যুষিত একটি মিশ্রগাম। এখানে ২১টি কলই পরিবার ও একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। তৈছাংছড়ার পাশে অবস্থিত বলে এই গ্রামের নাম তৈছাং হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

।। তৈকৈ পাড়া ।।

এই গ্রামটি তেলিয়ামুড়ার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং তুইসিন্দ্রাইর সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামটিতে প্রায় ১৫টি কলই পরিবার বাস করে। কলই সমাজের প্রাচীন ব্যক্তি শ্রীজীবন কলইর বাড়ী এই গ্রামে অবস্থিত।

।। এরামপাড়া ।।

উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত, বড়মুড়ার নিকটবর্ত্তী এই গ্রামটিতে পূর্বে কলই বসতি ছিল। কলই সমাজের অনেক প্রাচীন রায়ের বাড়ী এই গ্রামে ছিল। বর্ত্তমানে এখানে কোন কলই পরিবার নেই।

।। লুথুর ।।

বড়মুড়ার নিকটবর্ত্তী উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত। পূর্বে এখানে কলই বসতি ছিল বলে জানা গিয়েছে। বর্ত্তমানে এখানে কোন কলই পরিবার নেই।

।। কোণাবন ।।

এইগ্রামটিও বড়মুড়ার নিকটবর্ত্তী উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত। এখানেও পূর্বে কলইরা বসবাস করত বলে জানা গিয়েছে। বর্ত্তমানে এখানে কোন কলই পরিবার নেই।

।। ছাইমারুয়া ।।

এই গ্রামটিও বড়মুড়ার পাশে উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত। পূর্বে এই গ্রামেও কলইগণ বসবাস করত। চারজন প্রাচীন কলই রায়ের বাড়ীও এই গ্রামে ছিল বলে জানা গিয়েছে।

।। ব্রহ্মছড়া ।।

তেলিয়ামুড়া থেকে প্রায় ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণ পূর্ব দিকে খোয়াই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়েই ব্রহ্মছড়া নামে একটি ছড়া প্রবাহিত হচ্ছে বলেই এই গ্রামের নাম ব্রহ্মছড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই গ্রামে কলইদের বিভিন্ন শাখার লোক বাস করে। এখানে ওয়াপ্লম শাখার লোক সংখ্যাই বেশী এবং এখানকার গাঁও প্রধান হলেন ওয়াপ্লম হদার শ্রীইন্দ্র কলই। এই গ্রামে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে। এই গ্রামের অধিকাংশরাই সমতলভূমি চাষাবাদ করে এবং তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থাও বেশ ভাল। এই গ্রামে বেশ কয়েকটি ঢেউ টিনের ঘর আছে।

।। তুইসিন্দ্রাই ।।

তেলিয়ামুড়া থেকে প্রায় ৪ কিঃমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে আসাম-আগরতলা রোডের প্রায় দুই কিঃমিঃ দক্ষিণে এই গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামটিতে বেশ কয়েকটি কলই পরিবার বাস করে এবং এটিও কলই-বাঙ্গালী অধ্যুষিত একটি মিশ্রগ্রাম।

।। পাথ্রুপাড়া ।।

এই পাড়াটি বৈশ্যমুনি পাড়া থেকে প্রায় ১০ কিঃমিঃ পশ্চিমে বড়মুড়ার পাদদেশে অবস্থিত। পূর্বে এখানে কলই বসতি ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরবর্ত্তীকালে এই গ্রামের লোকজন পার্শ্ববর্ত্তী যন্ত্রণাপাড়া, হলুয়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে চলে এসেছে। বর্ত্তমানে এই গ্রামে কোন লোক বাস করে না। পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা থেকে অনেকে এসে এই গ্রামে বর্ত্তমানে জুম করে।

পরিশিষ্ট -ক
হালাম-কলই

১৩৪০ ত্রিং সন হইতে ১৩০০ ত্রিং সন পর্যন্তের
ইম্পিরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল টেবলসমূহ

সেন্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত হাতের	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						ুম	কৃষি	অন্যান্য	ুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	৩৫৭	১৯৭	১৬০	৩৪৬	১১	১১	৬৫	২	৬৩	৪৪	১০০	১	৮৭	৮৮	১	—	—	—
সোনামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	৫৭৭	২৭২	৩০৫	৫৭৭	—	০	২০	১০	২৬	৭	১৫১	—	১২৬	১১৮	১	—	—	১
অমরপুর	৬৭০	৩৫১	৩১৯	৬৭০	—	৪৩	১৭	২	৪	১	১	১৪	১২৮	১২১	—	—	১	—
খোয়াই	৯১	৪৯	৪২	৯১	—	১৭	—	২	১৭	—	—	—	২৩	২৩	—	—	—	—
কৈলাশহর	৩	১	২	৩	—	১	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলোনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্বমোট	১৬৯৮	৮৭০	৮২৮	১৬৮৭	১১	১৬২	১০২	১৬	১১১	৫২	২৫২	১৫	৩৬১	৩৫০	২	—	১	১

পরিশিষ্ট -খ

হালামরা প্রধানতঃ বারটি দফা বা সম্প্রদায় বিভক্ত ছিল, তারা বার হালাম নামে অভিহিত হত। পরে ক্রমশঃ এদের অনেক সম্প্রদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের আদামশুমারীতে এদের ১৮টি দফা পাওয়া গিয়েছে। তাদের জনসংখ্যা বা বাস্থান নিম্নে দেওয়া হলো।

দফা	জনসংখ্যা			বাসস্থান
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	
১। কলই	৮৭০	৮২৮	১,৬৯৮	সদর, উদয়পুর, অমরপুর খোয়াই ও কৈলাসহর বিভাগ
২। কুলু বা খুলং	২৭	৩৩	৬০	কৈলাসহর বিভাগ
৩। কর্ব্বং	১৯	১৯	৩৮	সদর বিভাগ
৪। কাইপেং	৪১২	৪০২	৮১৪	সদর ও অমরপুর বিভাগ
৫। কৈরেং	২০৮	২০৭	৪১৫	অমরপুর বিভাগ
৬। চড়ই	৮৫১	৭৯৩	১,৬৪৪	কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ
৭। ছাইমালা*	৫৫	৪৩	৯৮	সদর বিভাগ
৮। ডাব্	১১	৬	১৭	কৈলাসহর বিভাগ
৯। থাংচেপ বা থাঙ্গচেপ্	৭২	৫৮	১৩০	কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ
১০। সাক্চেপ বা আকচেপ্	৮৩	৭৭	১৬০	কৈলাসহর বিভাগ
১১। নবীন	১০৫	১০৫	২১০	ঐ
১২। বংশেল্	১০৮	১১১	২১৯	অমরপুর, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ
১৩। মরছুম	১,৮১৭	১,৬৮২	৩,৪৯৯	সদর, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই ও ধর্ম্মনগর বিভাগ
১৪। মুরঢাকাং বা মুড়াসিং	১০৯	১১২	২২১	কৈলাসহর বিভাগ মুড়সিং
১৫। রাংখল	২৯৩	৩২৬	৬১৯	সদর , অমরপুর খোয়াই ও ধর্ম্মনগর বিভাগ
১৬। রূপিনী বা রূপিনী	৭৮৮	৬৪৭	১,৪৩৬	সদর, খোয়াই, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ
১৭। লাঙ্গই	২৩৮	২২১	৪৫৮	কৈলাসহর বিভাগ
১৮। লাংলুং	১৬৬	১৫২	৩১৮	ধর্ম্মনগর বিভাগ
মোট-	৬,২৩১	৫,৮২৩	১২,০৫৪	

*বাস্তবিক পক্ষে এরা হালাম নয়-কুকি, কিন্তু সেন্সাসে এদেরকেহালাম বলে ধরে নেয়া হয়েছে।
এরা নোয়াতিয়া, কিন্তু সেন্সাসে হালাম বলা হয়েছে।
[১৩৪০ ত্রিং সনের -ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিররণী। ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, পৃষ্ঠা-৮১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতি

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের মত কলইরাও পূর্বে পাহাড়ের বিভিন্ন টিলাভূমিতে বাস করত এবং জুমই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী যেমন - ধান, তিল, মরিচ, বেগুন, কুমড়া, কার্পাস, মেশ্‌তা ইত্যাদি জুমেই উৎপন্ন হত। সারা বৎসরই তারা জুমের কাজে যুক্ত থাকত। জুমকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত হত। তাছাড়া জুম তাদের কাছে শুধু জীবিকাই নয় জুম ছিল তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জুমের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে রচিত হয়েছে বিভিন্ন গান, বাজনা, নৃত্য ইত্যাদি। আজও জুম নৃত্য খুবই জনপ্রিয়। কলইরা খুব ভোজনপ্রিয় এবং মাছ-মাংস তাদের প্রিয়খাদ্য। তখন তারা পাহাড়ের মধ্যে হরিণ, শূকর ইত্যাদি শিকার করত এবং সবাই শিকার করা পশুর মাংস চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বন্টক করে খেত। এই শিকারের উপর ভিত্তি করেও রচিত হয়েছে তাদের বিভিন্ন গান, নৃত্য ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে কলইরা পাহাড়ের নীচু সমতল জমিতে চাষাবাদ শুরু করে। বর্তমানে অধিকাংশ কলই পরিবারই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। সমতলে বসবাসকারী কলইরা সাধারণত মাটির দেওয়াল দিয়ে ছনবাঁশ বা টিনের ছাউনি দিয়ে বসত বাড়ি তৈরী করে। কিছু কিছু পাকাবাড়িও দেখা যায়।

কৃষিকার্য্যের পাশাপাশি তারা বহুমুখী উপার্জনের উৎস থেকে যেমন মৎস্যচাষ, পশুপালন, বাগিচাফলণ, শাকসব্জী চাষ ইত্যাদি দ্বারা তারা অর্থ উপার্জন করে। বাগিচা ফসলের মধ্যে আনারস, কমলালেবু, মুসাম্বি, লেবু, আম, কলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মৎস্যচাষে কলইরা খুবই দক্ষ এবং এব্যাপারে তারা আধুনিক মৎস্যচাষের পদ্ধিত অনুসরণ করে। বৈশ্যমনি পাড়া, যন্ত্রনা পাড়া ইত্যাদি গ্রামগুলি

মৎস্যচাষের জন্য প্রসিদ্ধ এবং মৎস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা পুরস্কারও পেয়েছে। তাদের উৎপাদিত মাছ স্থানীয় বাজার এমনকি আগরতলা বাজারেও বিক্রী হয় এবং এ থেকে তাদের যথেষ্ট আয় হয়।

কলইদের প্রিয়খাদ্য হল ভাত, মাছ, মাংস, শুকনা মাছ, সব্জি ইত্যাদি। মোরগ, ছাগল, শূকর ইত্যাদি তারা নিজেরাই প্রতিপালন করে এবং পরিবারের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রি করে তারা অর্থ উপার্জন করে।

বর্ত্তমানে রাবার বাগিচার প্রতি কলইরা আকৃষ্ট হচ্ছে এবং রাবার বাগিচা তাদের অর্থনীতিকে অধিকতর স্বচ্ছল করেছে।

কলইদের মধ্যে বেশ কিছু পরিবার এখন বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনেক কলই পরিবার মুদি দোকান, কাপড়ের দোকান, বাসনপত্রের দোকান, মাছ বিক্রির দোকান, সব্জি বিক্রীর দোকান ইত্যাদিতে যুক্ত এবং তাদের ব্যবসা তারা দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে।

কলইরা বর্ত্তমানে পরিবহন (Transportation) ব্যবসার সঙ্গে ও ক্রমশ যুক্ত হচ্ছে এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে উন্নতি করছে। এখন তাদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাসগাড়ী, কমাণ্ডার জীপ, অটো রিক্সা ইত্যাদি বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করছে। তাদের অনেকের ব্যক্তিগত গাড়ী (Car)ও আছে।

কলইদের মধ্যে কিছু সংখ্যক যুবক ঠিকাদারি (Contractor) ব্যবসা সুনামের সঙ্গে করছে এবং এ থেকে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সর্বোপরি কলই সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ত্রিপুরা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছে যা তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার পথকে সুগম করেছে। বর্তমানে তারা যে সব পদে কর্মরত আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি যেমন- প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যংক অফিসার, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস, ত্রিপুরা পুলিশ সার্ভিস ইত্যাদি। তারা প্রত্যেকেই যোগ্যতার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে।

তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে তারা ব্যংক পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা ব্যংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং সময়মত তা পরিশোধ করে। REGA, IAY ইত্যাদি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক প্রকল্পের কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও সুদৃঢ় করছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজনীতি

কলইদের ভিতরগত বিভিন্ন শাখা

ত্রিপুরার কলই সম্প্রদায় ৭টি (সাত) শাখা বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। জনসংখ্যার ক্রমানুসারে এই সাতটি শাখা হল (১) উাপ্লম, (ওয়াপ্লম) (২) উাকবুর (ওয়াকবুর), (৩) রুজগুই, (৪) বুকাং, (৫) আবেল, (৬) কুছু এবং (৭) চড়াই। জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম পাঁচটি শাখার জনসংখ্যাই অপেক্ষাকৃত বেশী এবং কুছু ও চড়াই শাখার জনসংখ্যা খুবই কম। নিম্নে কলইদের প্রথম পাঁচটি শাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ঃ-

(১) ওয়াপ্লম ঃ- এই শাখার জনসংখ্যাই সর্বাধিক। কলই সম্প্রদায়ের বৃদ্ধব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে এই শাখার লোকগণ খুব পরিস্কার পরিছন্ন থাকতেন এবং তাঁদের দেহের বর্ণ কাচা বাঁশের ভিতরের সাদা অংশের ন্যায় পরিস্কার (সাদা) ছিল বলে তাঁদেরকে ওয়াপ্লুম বলা হত। উাপ্লম (ওয়াপ্লম) শব্দটি এসেছে কক্‌বরক শব্দ উা (ওয়া) = (বাঁশ) এবং বপ্লম = (বাঁশের ভিতরের সাদা অংশ) থেকে। উাপ্লম (ওয়াপ্লম গণ সম্পর্কে কক্‌বরকে বলা হয় "উা (ওয়া) বপ্লম সুক কুফুর হিনৈ (ওয়াপ্লম) হিনজাগো"। অর্থাৎ বাঁশের ভিতরের সাদা অংশের ন্যায় শ্বেত বর্ণের বলে তাদেরকে উাপ্লুম (ওয়াপ্লম) বলা হয়।

(২) উাকবুর (ওয়াক্‌বুর) ঃ- এই শাখা সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে এই শাখার লোকগণ বাঁশের ভেলা নিয়ে চলতে ভালবাসতেন অথবা বাঁশের ভেলায় করে ত্রিপুরার এসেছিল বলে তাঁরা 'উাকবুর' (ওয়াক্‌বুর) নামে পরিচিত হয়েছেন। উাকবুর (ওয়াক্‌বুর) একটি কক্‌বরক শব্দ এবং এই শব্দটি এসেছে উা (ওয়া) = বাঁশ এবং বুর =ভেলা শব্দ থেকে।

(৩) রুজগুই ঃ- জনসংখ্যার দিক থেকে এই শাখার স্থান তৃতীয়। এই শাখার লোকগণ সকলের সঙ্গে মিলে মিশে সংগতি বিধান করে চলতে খুব অভ্যস্থ ছিল বলে তাঁরা রুজগুই নামে পরিচিত হয়েছে। অনেকের মতে কক্‌বরক শব্দ 'রুখথার' (অনুসরণ করা) থেকে রুজগুই শব্দটি এসেছে অর্থাৎ তাঁরা অন্যকে অতি সহজেই অনুসরণ করতে পারেন। কলইদের এই শাখায় অন্যান্য বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর প্রবেশ ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

(৪) বুকাং ঃ- কলইদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে এই শাখার পূর্ব্ব-পুরুষগণ দৈহিক দিক থেকে খুবই শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁরা অত্যধিক মাত্রায় ভোজ করতে পারতেন। এই জন্য তাঁদেরকে বলে চাক্রাক (অর্থাৎ অত্যধিক ভোজন করে)। বাইকাং নামক এক প্রকার বরবটী জাতীয় সব্জী (যা খেলে কিছু নেশা ধরে) তাঁদের কাছে খুব প্রিয় বলেও তাঁরা বুকাং নামে পরিচিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই বাইকাং সব্জীর বীজ তারা ভাজা করে খেতেন এবং খোসাগুলি শুকিয়ে রেখে দিতেন এবং পরে খারপানি করে খেতেন। অমরপুর মহকুমার বৈশ্যমুণি পাড়ায় এই শাখার লোক প্রচুর পরিমানে বাস করেন।

(৫) আবেল ঃ- এই শাখার কলইগণ অনেকেই কুকি সম্প্রদায় থেকে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। 'আবেল' শব্দটি কক্‌বরক 'আবিছা' (শিশু) শব্দ থেকে এসেছে অর্থাৎ প্রথম দিকে এই শাখার জনসংখ্যা খুবই কম থাকায় তাদেরকে শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এই শাখার প্রথম রায় ছিলেন সদরের বাতিবন এলাকার ওয়ানজুই রায়। এই শাখার লোকগণকে কলইদের ভাষায় বেতু (জংলী) বলা হত বলে জানা গিয়েছে।

৬। কুছু ঃ- এই শাখার কলইগণ সংখ্যার দিকে খুব অল্প।

২। চড়াই ঃ- এই শাখার লোকও কলইদের মধ্যে খুব কম।

ত্রিপুরার মহারাজা কর্ত্তৃক

কলইদের সিংহ উপাধি প্রদানের আদেশ

বর্ত্তমানে কলইদের মধ্যে অনেকেই সিংহ উপাধি ব্যবহার করেন। যদিও এই সিংহ উপাধি হালাম সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই ব্যবহার করার জন্য মহারাজা আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু একমাত্র কলইরাই মহারাজার আদেশ রক্ষা করেছিলেন ও সিংহ

উপাধি ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন। নিম্নে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুরের এই সংক্রান্ত আদেশের একটি অনুলিপি দেওয়া হল ঃ-

হালাম সম্পর্কিত ৩৪নং আদেশ

স্বাঃ- শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

দরবার বিষম-সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য-স্যার বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। ইতি

সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দে তারিখ ১০ই আশ্বিন।

যেহেতু হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শাখার হালামগণের স্ব-স্ব নামের সঙ্গে বিভিন্ন দফার পরিচয় ব্যতীত উপযুক্ত পদবীর ব্যবহার প্রচলন থাকা দৃষ্ট হয় না এবং যেহেতু তাহাদিগের পক্ষে একটি নির্দ্দিষ্ট পদবী ব্যবহার করা সঙ্গত, অতত্রব আদেশ করা যায় যে, অতঃপর হালাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাভুক্ত জনগণ স্ব স্ব নামের সঙ্গে "সিংহ" পদবী ব্যবহার করে। উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করা যায় যে, বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি "রামচন্দ্র কলই" নামে পরিচয় প্রদান করে সে অতঃপর "রামচন্দ্র সিংহ" অথবা অধিকতর সঙ্গত রূপে "রামচন্দ্র সিংহ কলই" পদবীতে পরিচিত হয়।

মন্ত্রী পরিষদ অফিস
পঞ্চ চত্বারিংশ ভাগ-বিশেষ সংখ্যা
৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৬ ত্রিং

কলইদের বিয়ে

কলইদের বিয়ে সাধারণত তাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়। বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত আত্মীয়স্বজন অথবা তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ছেলের মা-বাবা এবং কন্যার মা-বাবার মতামত জেনে নেওয়া হয়। তারপর কথাবার্তা বলে বিয়ের একটি তারিখ ঠিক করে নেওয়া হয়। তাদের বিয়ে সাধারণত চৈত্র ও পৌষ মাসে হয় না। অন্যান্য মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসকে তারা বিয়ের জন্য উৎকৃষ্ট মাস বলে মনে করে। বিয়ের জন্য পঞ্জিকার মাধ্যমে তারা একটি শুভদিন ধার্য্য করে। বিয়ে দিনের বেলা ও রাত্রিবেলা এই উভয় সময়েই হতে পারে। তবে পাহাড়ের দূরবর্তী অঞ্চলের লোকগণ দিনের বেলা বিয়ের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ছৌংলাই মানি ঃ- এটা মঙ্গলচরণের অনুরূপ। ঐদিন উভয় পক্ষের সাক্ষাত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের তারিখ স্থির করা হয়। এই দিনই বিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত আলাপ আলোচনা স্থির করা হয়। বিয়ে জামাই খাটা (চামারি তংমানি) পদ্ধতিতে হবে না কন্যাদান (হামজুক রহমাণি) পদ্ধতিতে হবে এবং জামাই খাটা পদ্ধতিতে হলে জামাইখাটার মেয়াদ কতদিন হবে তাও ঐ দিনেই স্থির করা হয়। বিয়ের খাওয়া দাওয়া বা কোন দেনা পাওনা থাকলে তাও ঐ দিনই স্থির করা হয়। ছৌংলাই মানির পর বিয়ের দিন পরিবর্তন করা যায় না। কোন পক্ষ থেকে এর ব্যতিক্রম হলে কলই সমাজের রায়ের (সর্বপ্রধান) কাছে যে কোন পক্ষ বিচারের জন্য অভিযোগ করতে পারে।

পূর্বে শুধু অচাই (পুরোহিত) দ্বারা লাম্প্রাপূজার মাধ্যমেই বিয়ের মঙ্গলামঙ্গল ঠিক করা হত। এই অনুষ্ঠানটি অবশ্য ছৌংলাই মানির আগে করা হত। বর্তমান পঞ্জিকার মাধ্যমে বিয়ে স্থির করার উপরই সর্বাধিক গুরত্ব দেওয়া হয়।

পূর্বে কলইদের মধ্যে বিয়ের যে দুরকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা হল (১) জামাই খাটা (চামারি তংমাণি) ও (২)কন্যাদান পদ্ধতি (হামজুক রহমাণি)।

(১) জামাই খাটা ঃ- এই পদ্ধতিতে বর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্বশুর বাড়ীতে থাকবে এবং তার থাকার মেয়াদ শেষ হলে সে তার বাড়ীতে স্ত্রীকে নিয়ে আসবে। অবশ্য ইচ্ছা করলে বর তার শ্বশুর বাড়ীতেই পরবর্তীকালে আলাদাভাবে বসবাস করতে পারে। এই বিয়ে মেয়ের বাড়ীতেই হয়।

এই পদ্ধতিতে বিয়ে হলে বর বিয়ের একদিন আগেই মেয়ের বাড়ীতে আসে।

অবশ্য ঐ দিনসে তার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে মেয়ের বাড়ীর পাশে পূর্ব নির্ধারিত কোন বাড়ীতে থাকে। বিয়ের আগের দিন মেয়ের বাড়ীতে যাওয়ার আগে বর তার গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে সাধ্যমত ভোজন করায়। এই ভোজনকে 'চালাই-মাণি' বলে। তার কারণ হল বর বিয়ের পর তার জামাইখাটার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তার গ্রামে ফিরবে না।

বিয়ের দিন বর নাপিত দিয়ে চুলকাটানোর পর স্নান করে সকালে স্নান শেষ করার পর অচাই লম্প্রাওয়াথপ দেন। তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতও মন্ত্র পাঠ করান। বিয়ের দিন বরকে উপবাস থাকতে হয়। বরের সঙ্গে যে অচাই থাকেন তিনি এবং যে দুজন আইয়াজুকও আইয়াচালা থাকবেন তাদেরও উপবাস থাকতে হয়।

আইয়াচালাগণ বরকে তার বিয়ের সময়কার সবরকম কাজকর্মে সাহায্য করেন। তারা বরকে স্নান করান ও অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনা করেন। অপরদিকে আইয়াজুকগণ কন্যাকে তার ঐ সময়কার কাজকর্মে সাহায্য করেন। আইয়াজুকগণকে অবশ্যই সধবা হতে হবে। কোন বিধবা মেয়েলোক বা বিপত্নীক-বিবাহ সংক্রান্ত কাজকর্ম করতে পারেনা। আইয়াজুকদের একজনের হাতে একটি ঝারি (জলরাখার জন্য বদনা জাতীয়-একপ্রকার পাত্র) থাকে এবং তাতে জল, আম্রপল্লব, দুর্বা ইত্যাদি রাখা হয়। এই ঝারি থেকে বর ও কনের মাথায় জল ঢালা হয়। অপর আইয়াজুকের হাতে থাকে একটি বেলি (এটা-বড় একটি কাসার থালা)। তাতে পান, সুপারী, ধান, দুর্বা ইত্যাদি-একটি নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বিয়ের দিন সকালবেলা আইয়াজুকদ্বয় অন্যান্য অনেক মেয়েলোকের সঙ্গে-বাদ্যকরসহ কনের গ্রামের চৌধুরীকে সম্মান স্বরূপ পান ও ফুল দেয়। এই অনুষ্ঠানকে 'খুমফুনু কামানি' বলে। চৌধুরী তখন সম্মানের সহিত পাঁচ টাকা আইয়াজুকদের দেন। বিয়ের কয়েকঘন্টা আগে বর ও কনেকে পৃথক পৃথক স্থানে কাপড় দিয়ে মুখ বাধা কলসী থেকে জল দিয়ে স্নান করানো হয়। বর যে বাড়ীতে উঠে সে বাড়ী এবং কনের বাড়ীর মধ্যে আইয়াজুকরা বাজনাসহ তিনবার আসা যাওয়া করে। এই তিনবার আসা যাওয়ার সময় তারা কনের বাড়ী ও বরের বাড়ীতে এসে উলুধ্বনি দেয়। এই অনুষ্ঠানকে 'আইয়ালাইছামানি' বলে।

এরপর বরকে ধূতি পাঞ্জাবী পরিয়ে কনের বাড়ীতে আনা হয়। কনের বাড়ীতে আসার পর বরকে জামাই বরণ (বরের পোযাক) কনের বাড়ী থেকে দেওয়া হয়। তারপর বরকে বিয়ের বেদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। বেদীটিতে বাঁশের চতুঃষ্কোণ একটি মঞ্চ তৈরী করা হয়। এই মঞ্চের উত্তর ও পশ্চিম দিকে চলাচল করার দুইটি

রাস্তা থাকে। বেদীর পাশে কনের পিতা ও পুরোহিত বসেন। সেখানে মন্ত্র পাঠ হওয়ার পর বরকে পাশের বিয়ের কুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। কুঞ্জটি বাঁশ ও কলাগাছ দিয়ে তৈরী করা হয়। কুঞ্জটি গোলাকৃতির তৈরী করা হয় এবং তার উত্তর পশ্চিম দিরে রাস্তা থাকে। কুঞ্জের ভিতর একটি চেয়ার রাখা হয়। বর পশ্চিমের রাস্তা দিয়ে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কনে তাদের চিরাচরিত পোষাক পরিধান করে সজ্জিত হয়ে আইয়াজুকসহ উত্তরের দরজা দিয়ে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর আইয়াজুকদের সাহায্যে বরকে প্রদক্ষিণ করে ও ফুল ছিটিয়ে দেয় এবং শেষে মালা বদল করে।

মালা বদলের পর বর ও কনে এক সঙ্গে বেদীতে যায়। সেখানে ও বর পশ্চিম দরজা দিয়ে এবং কনে উত্তর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। সেখানে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করান। এরপর অচাই আসেন এবং মন্ত্রপাঠ করে বর ও কনেকে কাপড় বেঁধে বেদীর মধ্যে সাতবার প্রদক্ষিণ করান। তারপর তাদের বেদীর মাঝখানকার উঁচু জায়গায় দাঁড় করিয়ে তাদের মাথায় শান্তিজল দেওয়া হয়। এই জল প্রথম আচাই ও অচাইর স্ত্রী দিয়ে থাকেন (অচাইকে অবশ্য স্ব-স্ত্রীক হতে হবে)। এই জল একটি বাঁশের চোঙ্গার (তৈলাংখাং) থেকে দেওয়া হয়। এই তৈলাংখাং এর মধ্যে বাঁশের পাতা ও তুলসীপাতা থাকে এরপর আইয়াচালাদ্বয় (স্ব-স্ত্রীক) এবং আইয়াজুকদ্বয় (স্বামীসহ) ঝারি থেকে বর ও কনের মাথায় জল ঢেলে থাকে। তারপর অন্যান্যরা জল দিয়ে থাকে তবে জলদাতাগণকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে। অ নেক সময় দেখা যায় যে বর ও কনের মাথা নাগাল না পাওয়ায় জলদাতাগণ টেবিল, গাইল (রুসাম) ইত্যাদির উপর দাঁড়িয়ে তাদের মাথায় জল ঢালে। শান্তিবারি দেওয়া শেষ হওয়ার পর কনেকে তার নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় কনে মাটি স্পর্শ করতে পারেনা তাই আইয়াজুকরা কনেকে শূন্যে করে তার ঘরে নিয়ে আসে এবং এখানে এসে সে তার ভেজা কাপড় পরিবর্ত্তন করে। অপরদিকে বরকেও আইয়াচালারা উপরে তুলে মাটি স্পর্শ না করে কনের ঘরে নিয়ে আসে।

তারপর আইয়াজুক, আইয়াচালা, অচাই, বর ও কনের বিশেষ বন্ধু বান্ধবগণ (ছিক্‌লা, ছিক্‌লী) একত্রে বর ও কনের সঙ্গে খেতে বসে। তাদের খাওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ জিনিষ তৈরী করা হয়। খাবারের জিনিষগুলির মধ্যে থাকে চাকুই (কচি বাঁশ পুরানো ছাইয়ের জলের সহিত কারকল বা কচুর শুকনা ডাঁটা বা আদাপাতা বা বাঁশের শুকনা কুরুল বা ব্যাঙের ছাতা (মুইখুমু) বা কলার থুর প্রভৃতি যে কোন একটির সঙ্গে মিশ্রন করে খুব সুস্বাদু করে তৈরী করা হয়), গোধক (শুকনা মাছ সহকারে কোন সব্জী বা

মাছের সঙ্গে একত্র করে একটি বাঁশের ভিতর ভরে আগুন দিয়ে পুড়ে তৈরী করা হয়), ডাল , টক, মাছ, মাংস ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আয়োজন করা হয়। খাওয়া দাওয়ার পর পান তামাক দেওয়া হয়। বিয়ে বাড়ীতে মদের ব্যবস্থা থাকলেও ইত্যাদি বর ঐদিন কোনরূপ নেশা করেনা। ভাত খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বর কনের মধ্যে পাশা খেলা হয়।

পাশাখেলা শেষ হওয়ার পর বর ও কনে যে ঘরে ঘুমাবে-সে ঘরে অচাই ও আইয়াজুকরা একটি সরিষার তৈলের চাটার (প্রদীপ) মধ্যেও বর ও কনের নামে দুটি আলাদা আলাদা সলতে (দসি) জ্বালিয়ে রেখে দেয়। এই দসি দিয়ে বর ও কনের ভবিষ্যতের মঙ্গলা মঙ্গল নির্ধারণ করা হয়। বরের নামের সলতে যদি আগে নিভে যায় তবে বুঝা যায় যে কনে বর অপেক্ষা বেশী সাহসী হবে এবং সে বরের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। অপর দিকে কনের নামের সলতো আগে নিভে গেলে বুঝা যাবে বরের অধিক সাহস হবে এবং বর কনের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। এই পরীক্ষাকে "চাতি ছাওমানি" বা চাটা জ্বালানো বলে ।

বিয়ের পরদিন বিকেলে বরযাত্রীক, আইয়াজুক ও আইয়াচালাগণ কনের বাড়ী থেকে বিদায় হয়। জামাইখাটা বিয়েতে শুধু বর ও কনে তাদের পূর্বনির্ধারিত সময় পর্য্যন্ত শ্বশুর বাড়ীতে থাকে এবং অন্যান্য সবাই বিদায় গ্রহণ করে। এই বিদায়ের সময় কনের বাড়ীর লোকেরা অনেকেই মদপান করে ও গানের মাধ্যমে আমোদ করে। বরের বাড়ীর লোকেরাও অনেকে বিদায়ের সময় গান গেয়ে থাকে। এভাবে কনের বাড়ীর লোকেরা বরের বাড়ীর লোকদের বিদায় জানাতে কিছুদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে। একে নাইরুগ্মানি"বলে।

(২) **কন্যাদান (হামজুক রহমানি)**ঃ জামাইখাটা না থাকলে বিয়ে সাধারণত ছেলের বাড়ীতেই হয়। এই বিয়েকে হামজুক রহমানি (হামজুক কনে, রহমানি দান) বলে। এই বিয়েতে শুধুমাত্র কনেকে বিয়ের আগের দিন বরের বাড়ীতে নিয়ে আসা ছাড়া কন্যাদান বিয়ের অধিকাংশ নিয়মকানুনই জামাইখাটা বিয়ের অনুরূপ। এই বিয়েতে দুইজন আইয়াসহ কনের কয়েকজন বান্ধবী ও আত্মীয়স্বজন বিয়ের আগের দিন বরের বাড়ীর পাশে পূর্বনির্ধারিত কোন বাড়ীতে কনে সহ থাকে। বিয়ের দিন সকালবেলা অচাই মোরগ বলি দিয়ে লাম্প্রাওয়াথপ্ দেয় এবং লাংখাং নিয়ে ছড়া থেকে শান্তিজল নিয়ে আসে। এখানে কনের পক্ষের আইয়াজুকদ্বয় পূর্বের মত বরের পাড়ার চৌধুরীর বাড়ীতে পান দেয় এবং চৌধুরী ও সম্মানস্বরূপ পাঁচ টাকা দেন। কন্যাদান বিবাহে নক্সার বরের বাড়ীতে তৈরী করা হয়।

বিয়ের পরদিন আইয়া বিদায় বা (মাইরুগ লাইঅ) করা হয় বরের বাড়ীর পক্ষ থেকে। এই পদ্ধতিতে কনে তার শ্বশুর বাড়ীতেই থেকে যায় এবং তার বন্ধু-বান্ধবীগণ ও আইয়াজুকগণকে বিদায় দেওয়া হয়।

বিয়ের প্রায় মাসখানেক পর বর ও কনে একসঙ্গে তাদের নিকট আত্মীয় স্বজন দু একজনকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে (কনের বাড়ীতে) ফিরাযাত্রায় যায়। এই অনুষ্ঠানকে 'থাংগার নাইমানি' (থংগার = ঘর-বাড়ী, নাইমানি = দেখানো) বলে অর্থাৎ এখনই বর তার শ্বশুরবাড়ীর ঘর দরজা দেখতে পায়।

অবশ্য জামাইখাটা পদ্ধতিতেও বিয়ের এক দুই মাস পর বর তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজবাড়ীতে তিন দিনের জন্য বেড়াতে যায়। তাকেও 'থংগারনাইমনি' বলে। তারপর জামাই খাটার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জামাই তার নিজ বাড়ীতে চলে যেতে পারে অথবা ইচ্ছে করলে শশুর বাড়ীর পাশেই ঘর বানিয়ে বসবাস করতে পারে।

পূর্ব্বে কলইদের মধ্যে জামাই খাটা বিয়েরই অধিক প্রচলন ছিল। এই বিয়েতে বর কনের বাড়ীতে গিয়ে বিয়ে করত। পরবর্ত্তীকালে কন্যাদান পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছিল। এই প্রথায় বিয়ের একদিন আগে ছেলের বাড়ীতে কনেকে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রথায় বিয়ে হলে বিয়ের আগে ছেলের গ্রামের চৌধুরী ও কন্যাপক্ষের লোকজনকে নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য একটি সভা করা হয়। এই সভাকে 'চালাইমানি' বলে। বিয়ের আগের দিন বরের বাড়ীতে কনেকে পাঠাবার পর বরের বাড়ীর কয়েকজন মেয়েলোক ও পুরুষলোক কনেকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বরের বাড়ী থেকে কিছুদূর আসেন। তাদের বলা হয় 'হামজুক লামজুকমানি'। কনের সঙ্গেও কয়েকজন কন্যাযাত্রী হিসেবে বরের বাড়ীতে যায় এবং তাদের বলা হয় 'হামজুকনীমানি'।

বর্ত্তমানে অবশ্য জামাইখাটা ও কন্যাদান প্রথা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এখন পার্শ্ববর্ত্তী অ-উপজাতিদের মত কলইদেরও অনেক বিবাহ-কনের বাড়ীতে হচ্ছে। যেখানে আগে কনের বাড়ীতে শুধু জামাইখাটা-বিয়ে হত সেখানে বর্ত্তমানে জামাইখাটা ছাড়াই কনের বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে। এখন বর বিয়ের দুদিন পর কনেকে সঙ্গে করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে।

পূর্বে বিয়ের জন্য কনের বয়সের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। অনেক সময় কনের বয়স বরের বয়স অপেক্ষা বেশী হত। বর্ত্তমানে অবশ্য কনে বয়সের দিক থেকে বর অপেক্ষা বড় হওয়া তাদের কাছে অবাঞ্ছনীয়।

পূর্বে কলইদের মধ্যে বিয়েতে যৌতুক দান প্রথা ছিল না। তখন তাদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী মেয়ের বাড়ী থেকে জামাইকে কাপড় -চোপড় রাখার জন্য একটি বাতল (বাক্স), কাজের জন্য একটি দা (টাক্কল) ও একটি কুথুক (ঢাকনাওয়ালা খাড়া বিশেষ) দেওয়া হত।

পূর্বে তাদের বিয়ে অচাই দ্বারাই সম্পন্ন হত। এরপর ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রভাব তাদের মধ্যে পড়েছে। বর্ত্তমানে যদিও অচাইর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন এখনও আছে।

কলইদের বিবাহ সাধারণত তাদের সমাজের লোকের মধ্যে সীমিত থাকলেও বর্তমানে তাদের সঙ্গে ত্রিপুরি, মরসুম, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক বিয়ে হচ্ছে। অপর দিকে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীদের সঙ্গেও কলইদের কয়েকটি বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে কলই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

নকসার ঃ কলইদের বিয়ে বাড়ীর (কনের বাড়ীতে বিয়ে হলে কনের বাড়ী অথবা বরের বাড়ীতে বিয়ে হলে বরের বাড়ীতে) পূর্ব্বদিকে বিয়ের কয়েকদিন আগেই একটি নতুন ঘর তৈরী করা হয়। এই ঘরকে নকসার বা নতুন ঘর (নক-ঘর, সার-নতুন) বলে। অর্থাৎ এই ঘর শুধুমাত্র বিয়ের জন্যই নতুন করে তৈরী করা হয় এবং খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

এই নকসারে বিয়ের দিন কলই রায়, কলই সমাজের শাসন বিভাগের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিগণ, গ্রামের চৌধুরীও অন্যান্য গণমান্য বিবাহিত পুরুষগণই শুধু এই ঘরে বসেন। এই ঘরে কোন মেয়েলোক বসতে পারে না। কোন কারণে কলই রায় আসতে না পারলে তার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন বিভাগের সাতজন ব্যক্তি থেকে একজন উপস্থিত থাকবেন। সাতজন কাইঠারের মধ্যে একজন কাইঠার উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। নকসারের ভিতর মদভর্ত্তি কলস সাজিয়ে রাখা হয় এবং কাইঠার তাদের প্রথা অনুযায়ী উপস্থিত সকল পাত্র-মিত্রকে মদ পরিবেশন করেন। বিয়ে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নকসার থেকে কেউই বের হয়ে আসতে পারবে না। এব্যাপারে অবশ্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। বিয়ে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভাসদ্গণ নকসার থেকে বের হয়ে আসেন এবং অন্যঘরে গিয়ে বসে খাওয়া দাওয়া করেন।

সামাজিক রীতিনীতি

উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় কলই সম্প্রদায়ের জনগণও খুবই সুশৃঙ্খল এবং ঐক্যবদ্ধ। সুষ্ঠু সামাজিক অনুশাসন, সমাজের প্রতিদায়বদ্ধতা ও আনুগত্য এবং সর্বোপরি গতিশীল সামাজিক নিয়মকানুন অর্থাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক নিয়মকানুনের প্রয়োজনীয় সংশোধন কলই সমাজকে উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। কোন সন্তানের মাতৃগর্ভে থাকা আস্থা থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিটি স্তরেই তাদের চিরাচরিত সামাজিক নিয়মনীতি মেনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন —

(১) কেবেঙবুমানি (২) অচাইমা (৩) থাপ্লাখৗবৗইমানি ও আবুর সুমানি (৪) খুমচাক - কানরিমা (৫) রিসা - সরমানি (৬) কাইলাইমা - বিবাহ (৭) থুইমানি - (মৃত্যু) (৮) শ্রাদ্ধ (৯) বেকেরেঙ থুবুইমা (অস্থিবিসর্জন) (১০) বাৎসরিক রায় বালমা পান্ডা।

(১) কেবেঙবুমানি ঃ গর্ভস্ত সন্তানের কল্যাণ এবং অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অচাই দিয়ে পূজা দেওয়া হয় এবং এই অনুষ্ঠানকে কেবেঙবুমানি বলা হয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের চকদিরি সহ সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের খাওয়ানো হয়।

(২) আচাইমা-(জন্ম) ঃ মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি দিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়। পুত্র সন্তান হলে পাঁচবার এবং কন্যা সন্তান হলে তিনবার উলুধ্বনি দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত সবাই খাওয়া দাওয়া এবং আনন্দ-স্ফূর্তি করে। আবুর সুমানি অর্থাৎ অশৌচ পর্য্যন্ত মা ও সন্তানকে আলাদা ঘরে রাখা হয়।

(৩) থাপ্লাখৗবৗইমানি ও আবুর সুমানি ঃ নবজাত সন্তানের শুকনা নাভি পুরানো দুলা (বেত দিয়ে তৈরী করা) দিয়ে বাড়ীর আবর্জনা ফেলার স্থানে ফেলে দেওয়া হয়। ঐ দিন বাড়ির পাশে ছড়ার ঘাটে গিয়ে অচাই গঙ্গা পূজা দেয়। এই পূজার পরই বাচ্চার মা ছড়াতে স্নান করতে পারে এবং বাচ্চার কাপড় চোপড় ধৌত করতে পারে। তারপর বাচ্চার নামকরণ ও শুদ্ধিকরণের জন্য ওয়াথপ পূজা দেয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রাম চকদিরি ও অন্যান্য গণ্য-মান্যদের নিমন্ত্রণ করা হয় ও নিয়মনীতি মেনে খাওয়াতে হয়।

(৪) খুমচাক কানরিমানি ঃ সন্তানের ৫-৬ বৎসর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে বস্ত্র পরিধান অনুষ্ঠান করা হয়। অচাইর মাধ্যমে পূজা দিয়ে এই অনুষ্ঠান করা হয়।

(৫) রিসা সরমানি ঃ কন্যা সন্তান কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলে যে

কোন শুভ দিনে বিশেষ করে গড়িয়া পূজার সময় গ্রামের যুবতীরা সবাই মিলে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার বক্ষে রিসা বেধে দেয়। এই অনুষ্ঠানকে রিসা সরমানি বলে। ঐদিন থেকে সে যুবতী হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং এরপর থেকে তার বক্ষ সর্বদা বস্ত্র আবেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকবে।

(৬) কাইলাইমা - (বিবাহ) ঃ বিবাহ হল একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজের স্বীকৃতি নিয়ে যুবক ও যুবতীরা সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করে। বিবাহে ছেলের নূন্যতম বয়স হবে একুশ এবং মেয়ের নূন্যতম বয়স হবে আঠার। কলই সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ হয়ে থাকে যেমন — (১) সামাজিক বিবাহ; (২) অসামাজিক বিবাহ (সককৌরাই বিবাহ); (৩) জাকচুম্পাঅই (বলপূর্বক বিবাহ); (৪) বিধবা বিবাহ; (৫) বি-পত্নীক বিবাহ; (৬) দ্বিতীয়/ তৃতীয় বিবাহ।

(১) সামাজিক বিবাহ ঃ বর এবং কনের উভয়পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাজপতিদের জানিয়ে অচাই দিয়ে বেদিতে হায়ার মধ্যে যে বিবাহ হয় সাধারণতঃ তাকেই সামাজিক বিবাহ হিসাবে ধরা হয়। আবার কেহ যদি নিজের ধর্ম অনুসরণ করে সমাজপতিদের জানিয়ে বিবাহ দেওয়া হয় তাহাও সামাজিক বিবাহ হিসাবে ধরা হয়। সামাজিকভাবে বিবাহিত ব্যক্তিরা সমাজে সক-গীনাঙ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তবে কোন অবস্থাতেই যুবক যুবতীরা বিবাহের আগে কোন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে বা কোন আপত্তিকর ঘটনা ঘটাতে পারবে না। যেমন- একই সঙ্গে পলায়ন করা, যুবতী যুবকের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা, যুবক-যুবতীর বাড়ীতে গিয়ে ওঠা, গর্ভবতী হওয়া, একই বিছানায় শয়ন করা, জোর করে বিবাহ করা ইত্যাদি। অসামাজিক বা সক-কৌরাই ভাবে বিবাহিত ব্যক্তিরা সমাজে সক-কৌরাই হিসাবে পরিচিতি পায়।

বিধবা বিবাহ ঃ কলই সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। সাধারণতঃ বিধবাদের বিবাহ বি-পত্নীকদের সঙ্গে দেওয়া হয়। এই বিবাহ শুধুমাত্র অচাই দিয়েই সম্পন্ন হয় এবং তারা সামাজিক সক পায় না। কিন্তু কোন কুমার যুবক যদি সামাজিকভাবে বিবাহের সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সমাজপতিদের জানিয়ে বেদিতে হায়ার মধ্যে বিবাহ করে তখন তারা সামাজিক সক-গীনাঙ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

সমাজে বিধবা বিবাহের মত বি-পত্নীকদেরও বিবাহ প্রচলিত ও স্বীকৃত। বি-পত্নীকদের বিবাহ সাধারণতঃ বিধবাদের সঙ্গে দেওয়া হয়। ইহাও শুধু অচাই দিয়েই সম্পন্ন হয় এবং তারা সামাজিক সক পায় না। কিন্তু যদি কোন বি-পত্নীক যুবক কোন কুমারী যুবতীকে সামাজিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজপতিদের জানিয়ে বেদীতে হায়ার মধ্যে বিবাহ করে তখন তারা সামাজিক সক পায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রচলিত বিয়ের পদ্ধতিকে আরও সুশৃঙ্খল ও যুগপোযোগী করার লক্ষ্যেও কলই সমাজে বিবাহে সমাজপতিদের অনুমোদন ও পঞ্জীকরণের উদ্দেশ্য আবেদন করার জন্য নির্দিষ্ট ফরম করা আছে এবং এই ফর্মের মাধ্যমে আবেদনকারীকে আবেদন করতে হবে।

(৭) মৃত্যু (থুইমানি) ঃ শবদেহ দাহ করাই কলইদের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু বৈষ্ণবদের দাহ করার পরিবর্তে নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ নিয়মকানুন মেনে সমাধিস্ত করা হয়। বর্তমানে কিছু সংখ্যক কলই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তাদেরও খ্রীষ্টধর্মনুযায়ী শবদেহ কবর দেওয়া হয়। তিন বৎসরের কম বয়সের কোন বাচ্চা মারা গেলে তাদেরকে বড় মাটির পাতিলে করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় এবং তাদের কোন শ্রাদ্ধ হয় না। কলইদের মধ্যে প্রধানতঃ চার ধরনের মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে — (ক) মৃত্যু কালীন অনুষ্ঠান (খ) শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান (গ) চুয়াক খানমানি বা খুম কানরিমানি অনুষ্ঠান এবং (ঘ) অস্থি বিসর্জন।

মৃত্যুকালীন অনুষ্ঠান ঃ সাধারণতঃ মৃত্যুর দিনই মৃত দেহ দাহ করা হয় কিন্তু বিশেষ কারণে পরদিনও দাহ করা যায়। মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যে মৃতব্যক্তিকে স্নান করিয়ে বারান্দায় উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুয়ানো হয়। মৃতের পায়ের নীচে ধান, তুলা ও তিল ঢেলে দেওয়া হয় এবং বুকের উপরে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

তখন মৃতদেহের পায়ের নীচে মোরগের বাচ্চা বলি দেওয়া হয় এবং সেই মোরগের বাচ্চাকে আগুনে পুড়ে এবং বাঁশের চোঙ্গায় রান্না করা ভাত ও অন্যান্য জলপানের জিনিষ শবদেহে নিবেদন করা হয়। এরপর আত্মীয় স্বজনেরা চোখে তেল, বুকে ফুল ও টাকা দিয়ে আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে অন্তিম শ্রদ্ধা জানায়। মৃত্যু বা দাহ করার দিনে ঐ গ্রামের লোকেরা কোন কাজকর্ম করে না। গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে দাহ কাজে যেতে হয়। সবাই শ্রদ্ধা জানানোর পর মৃত দেহ মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তানরা বা তাদের অবর্তমানে জ্ঞাতিদের মধ্যে চারজন বাঁশের মাচায় তোলে ৫/৭ বার বাড়ীর উঠানে বাম থেকে পরিক্রমা করে শ্মশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তখন একজন সামনে থেকে ধান, তুলা, ফুল, পয়সা রাস্তায় ফেলতে ফেলতে যায়। যাওয়ার সময় কোন ছড়া বা নদী যদি অতিক্রম করতে হয় তখন সেই ছড়া বা নদীতে সাদাসূতা বেঁধে দিতে হয়। শ্মশানে গিয়ে পুত্রদের মধ্যে একজনকে দাহ স্থানের জায়গা কিনতে হয়। তখন পয়সা মাটিতে ফেলে দিয়ে বাম হাতে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দাহ করার জায়গা প্রস্তুত করতে হয়। প্রস্তুত করার সময় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫টি করে লাকড়ির লগ সাজিয়ে তার উপর মৃত দেহকে উত্তরদিকে মাথা

রেখে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং তার উপর দুইস্তরে লাকড়ি দেওয়া এবং তার উপর সাদা চান্দি বেধে দেওয়া হয়। শ্মশানে মৃত ব্যক্তির জন্য চাটাই দিয়ে একটি অস্থায়ী ঘর তৈরী করে তার মধ্যে একটি খারা, দা, হুক্কা রেখে আসতে হয় এবং তার সঙ্গে একটি মোরগের বাচ্চা ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন শ্মশানে একটি লম্বা বাঁশে সাদা কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ইহাকে পলা বলে। তারপর চন্দন কাঠকে টুকরো টুকরো করে সবাই শবের উপর দিয়ে দেয়। তারপর পুত্র সন্তান শবদেহের বামদিকে থেকে ৫/৭ বার পরিক্রমা করে মুখাগ্নি করে। পুত্র সন্তানেরা মুখাগ্নি দেওয়ার পর অন্যান্য শ্মশান যাত্রীরাও একে একে আগুন দেয়। তারপর শবদাহ সম্পূর্ণ করার পর স্নান করে বাড়িতে আসে। তখন উঠানে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় তা স্পর্শ করে তুলসীপাতার জল ছিটা নিয়ে শুদ্ধ হয়।

শ্মশানের কাজ সম্পন্ন হলে শ্মশান যাত্রীরা সবাই মৃতব্যক্তির বাড়িতে আসে। সেখানে পারলৌকিক নিয়ম কানুন মেনে কিছু অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তারপর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি একটি সাদা কাপড়কে দুই ইঞ্চি পরিমাণ প্রস্থে ও দুইহাত পরিমাণ দৈর্ঘ্যে কেটে যে কোন লোহার চাবি বা জালের সীসাকে ঐ কাপড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে মৃতব্যক্তির পুত্রদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়। কোন মৃত ব্যক্তি যদি ১৩ বৎসরের উর্দ্ধে পুরুষ হয় এবং কোন মৃত মহিলা যদি বিবাহিত হয় তখন মৃতের জ্ঞাতিরা দাহ করার দিন থেকে ১৩ (তের) দিন নিরামিষ খাবে। মহিলারা দাহ করার দিন থেকে তিনদিন নিরামিষ আহার করবে। আবার কোন মৃত পুরুষ যদি তিন বছরের উপর এবং তের বৎসরের কম এবং কোন মৃত মহিলা যদি তিন বছরের উপর ও অবিবাহিত থাকে তখন জ্ঞাতিরা ৩ রাত্রি নিরামিষ আহার করে এবং মহিলারা ১ রাত্রি নিরামিষ আহার করে।

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিন তার পুত্র সন্তান বা জ্ঞাতি শ্মশান থেকে সব ছাই ভস্ম পাশের ছড়াতে ফেলে দেয়। ভস্ম তোলার আগে শ্মশান থেকে অস্থি তুলে নিয়ে একটি বাঁশের কৌটায় ভরে এনে উঠানে রাখা হয়।

(৮) **শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ঃ** কলইদের মধ্যে তিন রকম শ্রাদ্ধের প্রথা আছে — (১) তেরদিনের শ্রাদ্ধ, (২) ত্রিরাত্রি শ্রাদ্ধ এবং (৩) অপমৃত্যুর শ্রাদ্ধ।

তেরদিনের শ্রাদ্ধ ঃ তের বছরের উর্দ্ধে মৃত পুরুষ এবং বিবাহিত মৃত মহিলাদের শ্রাদ্ধ তের দিনে হয়। শ্রাদ্ধের আগের দিন ছেলেদের গলায় ঝুলানো দরাঙ কেটে দিয়ে মাথা মুণ্ডন করানো হয়। ঐদিন পরিবারের শুদ্ধির জন্য ওয়াথপ পূজা দেওয়া হয় এবং দুপুরে মাইখলাই দেওয়া হয়। দুপুরে সবাইকে অন্নভোজন করানো হয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে

বিয়ের পর, 'বর-কনে' আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে

সমাজপতিদের ও মহিলাদের আলাদা করে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারেও অন্যান্য অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ীই ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মৃতব্যক্তি যদি ৩ বৎসরের উর্দ্ধে এবং ১৩ বৎসরের নীচে হয় এবং মৃত মহিলা যদি ৩ বৎসরের উর্দ্ধে এবং অবিবাহিত হয় তখন দাহ করার ৩ রাত্রির পরদিন শ্রাদ্ধ করা হয়।

যদি কোন ব্যক্তির আত্মহত্যায়, দুর্ঘটনায় বা খুন হয় অর্থাৎ অপমৃত্যু হয় তখন দাহ করার ৭ দিন পর বা অমাবস্যার দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়।

চুয়াক খানমানি বা খুম - কানরিমানি ঃ মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধের পরদিন অনেকগুলি ফুলের মালা তৈরী করে সেগুলোকে নিয়ে সকাল বেলা সবাই বাদ্য বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে শ্মশানে যায় এবং ওয়াথপে ফুলের মালা সাজিয়ে দেয়। সেখানে মৃতের পুত্র সন্তান ওয়াথপের সামনে জল খাবার পরিবেশন করে এবং একে একে সবাই ওয়াথপে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। তারপর সবাই সেখান থেকে গান গেয়ে নাচতে নাচতে বাড়ীতে আসে।

(৯) অস্থি বিসর্জন ঃ খুম কানরিমানি শেষ হলে কোন শুভদিনে গ্রামের পাশে যে কোন নদীতে বা যে কোন তীর্থস্থানে অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয়।

কলই সমাজের কোন ব্যক্তি যদি নিখোঁজ বা নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তবে নিখোঁজ হওয়ার বার বৎসর পর তার নামে অপমৃত্যুর শ্রাদ্ধের নিয়মে শ্রাদ্ধ করা হয়।

(১০) রায় বালমা পান্ডা ঃ কলই সমাজের প্রধান উৎসব বাৎসরিক রায় বালমা পান্ডা। প্রত্যেক বৎসর অগ্রাহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে সাধারণত কলই সমাজপতি রায় এর বাড়ীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের অনেক আগেই সমাজ পরিচালন সভার সদস্যগণ মিলিত হয়ে বাজেট ও অনুষ্ঠানের রূপরেখা তৈরী করে। উৎসব সাধারণত তিন দিনের হয় — পূর্ণিমার আগের দিন থেকে পরের দিন পর্য্যন্ত। পূর্ণিমার আগের দিন দিনের বেলা অনুষ্ঠিত হয় কলই সমাজের বাৎসরিক কেরপূজা এবং সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। মূল অনুষ্ঠান হয় পূর্ণিমার দিন। শেষের দিনে হয় পানসিলা খুলুমা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আলোচনা সভায় প্রত্যেক পাড়ার চকদিরি তাদের বার্ষিক রিপোর্ট, বিভিন্ন সমস্যা, বিগত বছরের হিসাব এবং উন্নয়ণমূলক আলোচনা করেন। আলোচনাতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা উৎসবের শেষের দিন পানসিলা খুলুমানির সময় প্রকাশ করা হয়। এই উৎসবকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন —

(১) বাৎসরিক কের পূজা, (২) আলোচনা সভা, (৩) বলঙ সূওয়ারমা, (৪) ধর্মীয় প্রার্থনা সভা, (৫) প্রকাশ্য সমাবেশ, (৬) প্রদর্শনী মেলা, (৭) রায় বালমানির

মূল অনুষ্ঠান, (৮) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, (৯) পানসিলা খুলুমমা, (১০) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও খসরা হিসাব পেশ, (১১) যদি বর্ত্তমান রায়ের শেষ তিন বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয় তখন তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তা নূতন রায়ের উপর ন্যস্ত করা।

লোকসাহিত্য

কলইদের প্রণয়মূলক গান, ঘুমপাড়ানী গান, গল্প,ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি তাদের লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অন্যান্য জাতি, উপজাতির ন্যায় কলইরাও তাদের কথাবার্ত্তা, হাস্যরসের সময় এই সব লোক সাহিত্যের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে। কিন্তু লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ না করার ফলে এবং এ ব্যাপারে কলই যুবকদের উদাসীনতার ফলে তাদের লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি অবলুপ্তির পথে। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে এখনও কিছু ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গল্প ইত্যাদি শোনা যায়। এখনই এগুলি সংগৃহীত না হলে একদিন হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উৎসাহী সংগ্রাহকদের এখনই এগিয়ে আসা উচিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, কলই লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি সামান্য উচ্চারণগত পার্থক্য-ছাড়া ত্রিপুরীদের প্রায় অনুরূপ। এ ব্যাপারে রিয়াংদের সঙ্গেও তাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

নিম্নে কলইদের মধ্যে প্রচলিত নানাধরনের গল্প, প্রবাদ ও ধাঁধার কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেওয়া হল।

মখরাছানি কেরেং ককতীমা (বানরের গল্প)

একদিন সাতবোন একসঙ্গে তাদের পুরাতন জুম থেকে বেগুন আনতে গিয়েছিল। জুম থেকে বেগুন নিয়ে আসার সময় রাস্তার পাশে ছোট পাহাড়ী নদীতে স্নান করার জন্য তাদের খুব ইচ্ছা হল এবং তারা নদীর পাড়ে তাদের কাপড় চোপড় রেখে নদীতে স্নান করতে নামল। তখন একটা বানর পাশের একটি জঙ্গলে ছিল। বানরটি এই সুযোগে ঐ সাতবোনের কাপড় চোপড় নিয়ে গাছের উপরে উঠে পড়ল। এদিকে স্নান শেষ করার পর সাতবোন নদীর তীরে উঠে তাদের কাপড় দেখতে না পেয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপড় সহ বানরকে গাছের ডালে দেখতে পেল। তারা বানরকে তাদের কাপড় ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ

করল কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তখন কাপড় না পেয়ে হাত দিয়ে তারা লজ্জানিবারণ করতে লাগল। বানর তখন তাদের প্রত্যেক বোনকে একহালি (চারটি) করে বেগুন নিয়ে গাছের একধাপ করে উপরে উঠে কাপড় নেওয়ার জন্য বলল। প্রথমে সবচেয়ে বড়বোনকে বেগুনের পরিবর্ত্তে তার কাপড় ফেরৎ দিল। এভাবে বানর ছয়বোনকেই ক্রমান্বয়ে বেগুনের পরিবর্ত্তে তাদের কাপড় ফেরৎ দিল। কিন্তু সবচেয়ে ছোট বোন যখন তার কাপড় আনতে গাছের কয়েক ধাপ উপরে উঠল তখন বানর তাকে দুই হালি বেগুন নিয়ে আরও দুইধাপ উপরে উঠার জন্য বলল। এভাবে ছোট-বোন কাপড় নেওয়ার জন্য যতই উপরে উঠে বানর তাকে ততই একধাপ করে উপরে উঠার জন্য বলতে লাগল। এভাবে ক্রমে ক্রমে বানর গাছের একেবারে উপরে উঠে গেল এবং ছোট বোনকেও গাছের উপর তুলে নিল এবং সেখানে তাকে আটক করে রাখল।

এ অবস্থায় পড়ে ছোটবোন তার দিদিদেরকে কাঁদতে কাঁদতে তার দুরবস্থার কথা জানাল। তখন কোন উপায় না দেখে তার বড়বোনরা তাকে ঐ বানরকেই বিয়ে করে তার সঙ্গে সেখানেই থাকার জন্য বলল। ছোটবোন তখন কাঁদতে কাঁদতে অসহায়ের মত সেই বানরকেই বিয়ে করল এবং তার সঙ্গে বাস করতে লাগল। তারপর একসময় ছোটবোন গর্ভবতী হল। তখন একদিন সে বানরের কাছে টক খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং বন থেকে লটকন গোটা (এক জাতীয় টক ফল) আনার জন্য বলল।

তখন বানর ঐ টকফল আনতে গিয়ে ঐ ফল দেখে খাওয়ার জন্য তার খুব লোভ হল ও সে একমনে টকফল খেতে লাগল এবং বাড়ীতে আনার কথা ভুলে গেল। শেষে সন্ধ্যার সময় ঝুড়িটা দেখে তার স্ত্রীর কথা মনে হল এবং ঝুড়ি ভর্ত্তিকরে টকফলের খোসা নিয়ে বাড়ীতে এলো। তার স্ত্রী ঐ খোসাগুলি দেখে বানরকে যথেষ্ট গালাগালি করল। তার কিছু দিনের মধ্যেই বানরের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল এবং তার নাম রাখল 'তটে'। এর বেশ কিছুদিন পর বানরের স্ত্রী বানরকে টকফল আনার জন্য বললে বানর একটি ঝুড়ি নিয়ে 'নেওড়া' গোটা (টক জাতীয় এক প্রকার ফল) আনার জন্য দূরবর্ত্তী একটি বনে গেল। এই সুযোগে বানরের স্ত্রী তার বাচ্চাটকে নিয়ে তার বাপের বাড়ী পালিয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যার সময় বানর নেওড়া গোটা নিয়ে এসে তার স্ত্রী ও আদরের পুত্র তটেকে ডাকতে লাগল। কিন্তু তাদের কোন সাড়া না পেয়ে সে ভয় পেয়ে গেল এবং ঘরের চারদিক অনুসন্ধান করে তাদের দেখতে না পেয়ে সে মনের দুঃখে একটি খঞ্জুরী (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র)হাতে নিয়ে তাদের সন্ধানে গান গেতে গেতে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে লাগল। সে সময় বানর যে গানটি গেয়েছিল তা হল ঃ

দুনিদং দুরোং দুনিদং আনিতটেমা
বিয়াং থাং।
বৌছা তটেমানো ভাতে রুই
নকখাই সুকুই থাং হরতে রুই
দাছা দামারো তুইতে রুই

[হে প্রিয়া-তুমি ও আমার আদরের ছেলে 'তটে' আজ কোথায়? বাচ্চাটাকে কোলে করে সুন্দর ঝুড়ি নিয়ে আজ তুমি কোথায় গেলে]।

এভাবে বানর গান গেয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে খুঁজতে বিভিন্ন জায়গা ঘোরার পর একদিন সে তার শ্বশুরবাড়ী এসে হাজির হল। তার শ্বশুর-বাড়ীর লোক তাকে দেখে মারার জন্য তখন দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাদের মাথায় বানরকে মারার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা আসল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বানরকে কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে প্রথমে তাকে ভাল করে খাবার দিল এবং রাত্রিবেলা তাকে একটি ভাঙ্গা মাচায় ঘুমাবার জন্য দিল। মাচার-নীচে কুকুর, শূকর, ইত্যাদি ছিল এবং সরু সরু বাঁশের টুকরাকে কেটে মাচার নীচে খাড়া করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর বানর তার স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে ঐ মাচায় ঘুমোতে গেল। কিছুক্ষণ ঘুমাবার পর বানরের স্ত্রী তাদের বাচ্চাটা (তটে) নীচে পড়ে যাবে বলে বানরকে একটু সরে ঘুমাবার জন্য বলল। বানরকে সন্ধ্যার সময় প্রচুর মদ খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে সে এই ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পেল না। তারপর বানর যখন মাচার ভাঙ্গা অংশের কাছাকাছি এলো তখন তার স্ত্রী তাকে আরও একটু সরার জন্য বলল। বানর যখন একটু সরলো তখনই সে নীচের খাড়া করা বাঁশের উপর পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই শূকর ও কুকুরের কামড়ে বানর মারা গেল। এরপর বানরের স্ত্রী পাড়ায় পাড়ায় বানরের শুকনা মাংস বিক্রী করতে লাগল। কিন্তু তার বাচ্চাটা সবাইকেই তার বাবার মাংসের কথা বলে দেওয়ায় বানরের মাংস আর বিক্রী হল না।

বুড়াছা বাই বুরুচুক্ তাই মৌখরা রগনি কেরেং ককতৌমা

(বুড়া-বুড়ি ও বানরের গল্প)

এক বুড়া ও বুড়ি কোন এক পাহাড়ের ভিতর একটি টংঘরে বাস করত। একদিন তারা জুমে আলু লাগাচ্ছিল। সে সময় কয়েকটা বানর পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল থেকে তাদের কাছে এলো এবং বুড়া ও বুড়িকে যথাক্রমে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা বলে সম্বোধন করে তারা দুজনে জুমে কি লাগাচ্ছিল তা জিজ্ঞেসা করল। বুড়া-বুড়ি তখন তাদেরকে আলু লাগাচ্ছে বলে জানাল। বানরগুলো তখন তাদেরকে বলল যে এভাবে আলুবীজ লাগালে তা ভাল হবে না বরং আলুবীজগুলো সেদ্ধ করে পাতা দিয়ে মুড়িয়ে এবং তার সঙ্গে এক পাত্র করে মদ দিয়ে সেগুলো লাগালে আলুগাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি বড় হবে এবং ফলনও ভাল হবে। তখন বুড়া আলুবীজগুলো সিদ্ধ করে আনার জন্য বুড়িকে বলল। কিছুক্ষণ পর বুড়ি বাড়ী থেকে আলুবীজগুলো সেদ্ধ করে নিয়ে এলো। তখন বানররাও তাদেরকে আলুবীজ লাগাতে সাহায্য করল। এভাবে আলুবীজ লাগানো শেষ করার পর বুড়া ও বুড়ি তাদের টংঘরে ফিরে গেল। তখন ঐ সুযোগে বানররা এসে সব.আলুবীজগুলো জুম থেকে তুলে খেয়ে ফেলল এবং তার পরিবর্ত্তে ঐ জায়গায় বন্য-আলুরবীজ এনে লাগিয়ে দিল। এর কিছুদিন পর বুড়া ও বুড়ি একদিন জুমে গিয়ে দেখল সে আলু গাছগুলি খুব ভাল হয়েছে। তারপর একদিন তারা জুম থেকে আলু এনে রান্না করল কিন্তু ঐ আলু খেয়ে তাদের মুখ চুলকাতে লাগল। বুড়া লবণ মিশিয়েও আলুতরকারী খেতে পারল না। তখন বুড়া বুঝতে পারল যে এসব বনের আলু এবং তা বানরদেরই কাণ্ড।

তখন থেকেই বুড়া বুড়ি বানরদের এই চালাকির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চিন্তা করতে লাগল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর তারা একটি উপায় বের করল। বুড়ি একদিন বুড়াকে বলল যে সে যেন মরার ভান করে বিছানার উপর শুয়ে থাকে এবং সে (বুড়ি) তার জন্য কান্নাকাটি করবে। তারপর বুড়ি বানরদেরকে খুব কাতর ভাবে অনুরোধ করবে তাদের মৃত ঠাকুরদাকে শেষ দেখার জন্য। বানররা যখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করবে তখন সে (বুড়ি) সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিবে এবং এই সুযোগে বুড়া একটি লাঠি দিয়ে বানরগুলোকে মেরে ফেলবে।

তারপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন বুড়া মরার ভান করে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। বুড়ি তখন বুড়া মারা গিয়েছে বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। তখন বুড়ি বানরদের কাছে গেল এবং কেঁদে কেঁদে তাদেরকে বলল যে "দাদা ভাইরা,

তোমাদের ঠাকুরদা মারা গিয়েছে। তোমরা এসে তাকে শেষ বারের মত দেখে তার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করে যাও"। বানররা তা শুনে প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর সবাই বুড়ার মৃত্যুর কারণ বুড়িকে জিজ্ঞেস করল। বুড়ি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল যে "আমি তোমাদের ঠাকুরদা ছাড়া কি করে বাঁচব ভাই? তোমরা এসে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।"

বানররা সব শুনে দল বেঁধে সবাই তখন বুড়ার বাড়ীতে এলো এবং বুড়াকে মৃত ভেবে সবাই বুড়ার চারিদিকে বসে কাঁদতে লাগল। বুড়ি -পূর্বেই সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। বুড়ার মৃত্যুতে তার ভীষণ ভয় করছে বলে সে টংঘরের সমস্ত ফাঁক জায়গা বন্ধ করে দেবার জন্য বানরদেরকে বলল। বানররা তখন সমস্ত ফাঁক বন্ধ করে দিল। তারপর বুড়ি বুড়াকে তার মাচা থেকে লম্বা বেতটা বের করে বানরদেরকে মারার জন্য বলল। বানররা তা শুনে অবাক হয়ে বুড়িকে বলল যে "এসব আপনি কি বলছেন ঠাকুরমা।" এ খন বুড়ি বলল যে হঠাৎ তাদের দাদুর কথা মনে পড়ায় সে ভ্রমবশত ঃ আবোল তাবোল বলেছে। কিছুক্ষণ পর বুড়ি আবার বুকে তার বেতটা বের করে বানরদেরকে মারার জন্য বলল। তখন হঠাৎ বুড়া তার বিছানা থেকে উঠে পড়ল এবং লাঠি দিয়ে বানরদিগকে একটা করে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলল।

বানরগুলোকে মেরে ফেলার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বুড়া ভাত রান্না করার জন্য বুড়িকে বলল। বুড়ি-তখন মনের খুশীতে ভাত-রান্না করতে গেল। ভাত রান্নার সময় চাউল আনতে গিয়ে বুড়ি হঠাৎ চাউলের মট্‌কার (মাটিরভাণ্ড) ভিতর একটি বানরকে লুকিয়ে থাকতে দেখল এবং বুড়াকে ডেকে এনে ঐ বানরটাকেও মেরে ফেলার জন্য বলল। বানরটা তখন খুব কুরুণভাবে তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। সে তাদের ঘরের কাজে সাহায্য করবে এবং তাদের বাচ্চাকেও যত্ন করবে বলে জানাল। বুড়া বুড়ি এখন তাকে- তাদের ঘরে রেখে দিল। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর বুড়া ও বুড়ি দুজনে একদিন জুম নিড়াতে কিছু দূরবর্ত্তীস্থানে গেল। বানর তখন একা টংঘরে বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য রয়ে গেল। এই সুযোগে বানর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলল এবং তার মাংস ও চালকুমড়া দিয়ে তরকারী রান্না করল। বাচ্চার মাথাটাকে সে দোলনায় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখল এবং দোলনাটা দোলাতে লাগল। বানর বাচ্চাটাকে যে সময় মেরেছিল তখন জুমের মধ্যে বুড়ির মন এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। তখন তার খুব -জল পিপাসার হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুড়াকে নিয়ে টংঘরে ফিরে এলো। বুড়ি-ঘরে ফিরে

এসে তার বাচ্চাটাকে দোলনার উপর - ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। বানর তখন বুড়িকে বলল যে তাদের খাবার তৈরী হয়েছে গিয়েছে এবং তাড়াতাড়ি এসে খাওয়ার জন্য বলল। সে বুড়িকে বলল যে তার বাচ্চাটা এই মাত্র ঘুমিয়েছে। সুতরাং এখন তাকে তুললে সে কান্নাকাটি করবে। সে তাকে আরও জানাল সে টংঘরের পাশে সে একটি কচ্ছপ পেয়েছে এবং ঐ কচ্ছপের মাংসও ও চালকুমড়া দিয়ে তরকারী রান্না করেছে। বানর তখন বুড়াবুড়িকে খাওয়ার কথা বলে একটি কলস নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গেল। কিছুদূর গিয়ে বুড়া ও বুড়িকে সম্বোধন করে বানর বলতে লাগল যে "অ-বুড়াবুড়ি তোমাদের বাচ্চার মংস খেতে কেমন হয়েছে গো।"

একথা বলে বানর নদীতে না নেমে নিকটবর্ত্তী একটি গাছে উঠে আবার বলতে লাগল " অ-বুড়াবুড়ি তোমাদের বাচ্চার মাংস খেতে কেমন হয়েছে গো।" বুড়া ও বুড়ি ঐ কথা শুনে বাচ্চাটাকে তাড়াতাড়ি দেখতে গেল। দোলনার উপর বাচ্চার মুখে কাপড়টা তোলে তারা তাদের বাচ্চার ছিন্নমাথা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি একটি দা ও একটি কুঠার নিয়ে বানরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হল। নদীর ঘাটে গিয়ে তারা বানরকে একটি নিকটবর্ত্তী গাছের উপর দেখতে পেল। বুড়া তখন কুঠার দিয়ে গাছটি কেটে ফেলল কিন্তু বানর তখন অন্য গাছে লাফিয়ে চলে গেল। এভাবে অনেক গাছ কাটার পর বুড়া খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন বানর নদী পার হয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে বুড়া ও বুড়িকে উদ্দেশ্য করে বলল যে তাকে ধরতে হলে একটি কলসী, একটি গাইল ও একটি সেকাইট কোমরে শক্ত করে বেঁধে যদি বুড়া ও বুড়ি নদী পার হয়ে আসে তবেই তাকে ধরতে পারবে। বুড়া ও বুড়ি তখন ধুর্ত্ত বানরের বুদ্ধি অনুযায়ী কলস, গাইল ও সেকাইট কোমরে বেঁধে নদী পার হওয়ার জন্য নদীতে নামল। কিন্তু নদীর জল বেশী থাকায় কলস জলে ভরে গেল এবং গাইল ও সেকাইটের ওজনে বুড়া ও বুড়ি নদীতে ডুবে মারা গেল। এভাবেই বুদ্ধির সাহায্যে বানর বেঁচে গেল।

মৈশ্লেশানি কেরেং ককতীমা

(অজগর সাপের গল্প)

কোন এক গ্রামে সরদেং সিং নামে এক অচাই বাস করত। তাকে সবাই সরদেং অচাই বলে ডাকত। এই অচাইর দু'টি মেয়ে ছিল এবং তারা তাদের পিতার সঙ্গে জুমে কাজ করত। জুমের পাশেই একটি টং ঘরে তারা বাস করত। কিন্তু যত্নের অভাবে তাদের টং ঘরটি আশেপাশের টং ঘরগুলি অপেক্ষা খুব খারাপ ছিল। তাদের পিতা টং ঘরটি ঠিক করতে অসমর্থ থাকায় বর্ষার সময় তাদের ঘরের মধ্যে প্রচুর জল পড়ত। এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দু'বোন তাদের দিন কাটাত। তারপর

একদিন বৃষ্টি সময় ঘরের ভিতর প্রচুর জল পড়ায় বিরক্ত হয়ে বড় বোন বলল কেউ যদি তাদের টং ঘরটি ঠিক করে দেয় তবে তাকেই সে বিয়ে করবে।

পরদিন সকালে দু'বোন দেখতে পেল যে কে যেন তাদের টং ঘরটি খুব সুন্দর করে তৈরী করে দিয়েছে। তারা তাদের টং ঘরে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষপত্রও দেখতে পেল। তাদের জুম থেকে জিনিষপত্র আনার জন্য সুন্দর সুন্দর খাড়াও দেখতে পেল। কিন্তু ঐ সবই তৈরী করেছে একটি অজগর সাপ। বড় বোন তখন তার পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ঐ সাপকেই স্বামী বলে গ্রহণ করল। বড় বোন তারপর তার ছোট বোনকে বলল তার স্বামীকে (সাপকে) ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করতে। ছোট বোন প্রথমে ভয়ে রাজী হল না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বড় বোনের একান্ত অনুরোধে সে অজগর সাপটিকে নিমন্ত্রণ করতে রাজী হল। বড় বোন ভাত রান্না শেষ করার পর ছোট বোন গানের সুরে তার কুমুইকে (ভগ্নীপতিকে) ডাকল "কুমুয়ই কুমুয়ই কুমুই মাই চানা ফাদি বা" তখনই অজগর সাপটা এসে ভাত খেয়ে গেল।

তার কিছুদিন পর একদিন অচাই তার মেয়েদেরকে দেখার জন্য জুমে এলো। বড় বোন সে সময় টং ঘরে ছিল না। সে তখন অন্য বাড়ীতে বদলী কাজ করার জন্য গিয়েছিল। ছোট মেয়ের মুখ থেকে তখন তার বাবা সব কথা শুনতে পেল এবং খুবই রাগন্বিত হল। সে তখন ছোট মেয়েকে সঙ্গে করে একটি টাক্কাল হাতে নিয়ে জুমে গেল এবং ছোট মেয়েকে বলল তার কুমুইকে ডাক দেওয়ার জন্য। ছোট মেয়ে তখন সুর ধরে ডাকল "কুমুয়ই কুমুয়ই কুমুই মাইচানা ফাদি বা" এই ডাক শুনে সাপটি অন্যান্য দিনের মত খাওয়ার জন্য যখম মাথা তুলল তখন বৃদ্ধ অচাই তার টাক্কল (এক প্রকার দা) দিয়ে সাপটির মাথা দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর সাপের মাথাটা পার্শ্ববর্ত্তী একটি লুঙ্গায় (পাহাড়ের মধ্যে নীচু জলা জায়গা) ফেলে দিয়ে দেহটি বাড়ীতে নিয়ে এলো। ছোট বোন তখন সাপটির মাংস ভালভাবে রান্না করে নিজেরা খেল এবং বড় বোনকে খেতে দিল।

এদিকে বাড়ীতে আসার পরই বড় বোনের মন এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠল। তার দেহের অলংকারগুলি -নাকফুল, কানফুল ইত্যাদি ঝড়ে পড়ে গেল। তার ছোট বোন সমস্ত ঘটনাই তার কাছে গোপন রাখল। কিছুক্ষণ পর সে তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে জুমে গিয়ে তার কুমুইকে ডাকার জন্য বলল। ছোট বোন তখন অনেক সুর ধরে তার কুমুইকে (অজগর সাপকে) ডাকল কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। তা দেখে বড় বোনের ভয় আরও বেড়ে গেল। সে তখন নিজেই সুর ধরে তার স্বামীকে ডাকতে আরম্ভ করল-

"ডংয়ই ডংয়ই ডংয়ইমাই চানা ফাদি বা
ড ংয়ই ডংয়ই ডংয়ইমাই চা না ফাদি বা
ডংয়ই ডংয়ই ডংয়ইমাই চানা ফাদি বা"

এভাবে করুণ সুরে বড় বোন তার স্বামীকে ডাকতে লাগল। তার এই আকুল ডাক বনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কিন্তু তবুও সে তার স্বামীর খোঁজ পেল না।

বড় বোন তার স্বামীকে না পেয়ে ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের একদিক থেকে অন্যদিকে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে সে একটি ছড়ার (ছোট পাহাড়ী নদী) নিকট এসে উপস্থিত হল। ঐ ছড়ার পারে প্রচুর 'খুম্‌পুই' (দোলন চাঁপা) ফুল ফুটেছিল। ঐ ছড়ার মধ্যেই তার বাবা অজগর সাপটার মাথা ফেলেছিল। ছোট বোন ঐ ছড়ার পারের 'খুম্‌পুই' ফুলগুলি থেকে একটি তুলে তার কানে পরল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কানের ফুলটি শুকিয়ে গেল। তা দেখে বড় বোনের মনে সন্দেহ হল। সেও তখন একটি ফুল তুলে কানে দিল কিন্তু তার ফুলটি আগের মতই সতেজ রয়ে গেল। তখন তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল এবং তার মনে হল যে তার স্বামী ঐ ছড়ার মধ্যেই আছে এবং সে সময়ই সে স্বামীর উদ্দেশ্যে গান গেয়ে গেয়ে ছড়ার জলের মধ্যে নামতে লাগল।

"ডং গুয়ই ডংগুয়ই নাসিং গুরাদে,
ডংগুয়ই তুই অং তরু রোগ
খুম্পুই বারোরুগ নাসিং গুরাদে ডংগুয়ই"

এভাবে গান গেয়ে গেয়ে বড় বোন হাটু জল থেকে ক্রমে ক্রমে বুকজল পর্য্যন্ত নামল এবং ধীরে ধীরে জলের নীচে তলিয়ে যেতে লাগল ছোট বোন তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল যে দিদি এখন আমি একা কি করে থাকব। বড়বোন তখন তাকে বলল যে সে (ছোটবোন) এখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হলেই সামনে একটি ছোট চৌরাস্তা পাবে এবং ঐ চৌরাস্তার পাশেই ছয়টি শাখাযুক্ত একটি বটগাছ আছে। ঐ বটগাছের উপরে উঠে সে যদি বলে যে "এজগতে আমার মত সুন্দরী কেউ নেই, আমিই একমাত্র রাণী হবার উপযুক্তা এবং আমি যে কোন কাজ করতে পারি" তাহলেই রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। একথা বলেই বড়বোন জলের মধ্যে ডুব দিয়ে দিল। জলের নিচে গিয়ে সে এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ দেখতে পেল এবং তার সামনেই তার স্বামীকে দেখতে পেল।

ছোটবোন তখন বড়বোনের নির্দেশমত কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চৌরাস্তার পানে বটগাছটি দেখতে পেল। সে তখনই ঐ গাছে উঠে বড় বোনের নির্দেশ মত বলল " আমি রাজার স্ত্রী হবার উপযুক্তা। এ পৃথিবীতে আমার মত সুন্দরী আর কেউ নেই

আমি যেকোন কাজ করতে পারি চরকা কাটায়ও আমি ওস্তাদ।” সে সময় রাজার বিনন্দিয়ারা (মহারাজার সময় পার্বত্য এলাকায় পুলিশগণকে বিনন্দিয়া বলা হত) ঐ চৌরাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা একটি ছোট মেয়ের একথা শুনে গাছের উপরের দিকে তাকাল এবং কথিত ছোটবোনকে দেখতে পেল। রাজা তখন বনেই শিকার করছিলেন। বিনন্দিয়ারা সে সময় রাজার কাছে এসে ঐ সুন্দরী মেয়েটির কথা বলল। তখন রাজা লোকজন নিয়ে ঐ বট গাছ থেকে কথিত ছোট বোনটিকে নামিয়ে আনলেন এবং তাকে রাজ অন্তপুরে নিয়ে মহাধূমধামে বিয়ে করলেন।

তার বেশ কিছুদিন পর একসময় ছোটবোন সন্তান সম্ভবা হলেন। রাজা ঐ সংবাদ শুনে খুবই খুশী হলেন। রাজা একদিন ছোটরাণীকে তার কি খেতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞেস করলে ছোটরাণী তাকে মাংস খাওয়ার ইচ্ছা জানাল। রাজা তা শুনে শিকার করার জন্য বের হলেন। কিন্তু রাজা শিকারে যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই ছোটরানীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হল। সে তখন চাকর চাকরাণীদেরকে বলল রাজাকে খবর দেওয়ার জন্য। কিন্তু কেউই রাজাকে খবর দিল না। অন্যান্য রাণীরা তখন চক্রান্ত করে সাতভাঁজ কাপড় দিয়ে ছোটরাণীর চোখ বেঁধে দিল। তারপর প্রসবের জন্য ছোটরাণী যেখানেই যেতে লাগল সেখানেই অন্যান্য রাণীরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে ছোটরাণী কোন স্থান না পেয়ে একটি ছড়ার পাশে এসে ছ'টি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল। তখন অন্যান্য রাণীরা চক্রান্ত করে ছোটরাণীর সন্তানগুলিকে ছড়ার জলে ভাসিয়ে দিল এবং ছোটরাণীকে জানাল যে সে কাঠ, পাথর ইত্যাদি প্রসব করেছে। চোখ বন্ধ থাকায় ছোটরাণী তাদের কথাই বিশ্বাস করল। এদিকে শিকার থেকে ফিরে এসে ছোটরাণীর সংবাদ জানতে চাইলে অন্যান্য রাণীরা তাকে জানাল যে, ছোটরাণী পাথর, কাঠ ইত্যাদি প্রসব করেছে। রাজা তখন ভাবলেন যে ছোটরাণী নিশ্চয়ই ডাইনী নতুবা মানুষ কখনও পাথর, কাঠ ইত্যাদি প্রসব করতে পারে না। রাজা তখন ছোটরাণীর নাক, কান কেটে তাকে বনে গিয়ে ছাগল চড়ানোর হুকুম দিলেন। তারপর থেকে অতি কষ্টে ছোটরাণী তার দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে ছোটরাণী সন্তানদেরকে চক্রান্ত করে যখন ছড়ার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন বড়বোন (বাচ্চাদের মাসী) তাদের দেখতে পেয়ে কোলে তুলে নিয়ে আদর যত্ন করে বড় করতে লাগলেন। এভাবে তারা ছয় ভাই ও একবোন মাসীর যত্নে ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগল। এদিকে ছড়া থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার যারা কলসী করে জল নিতে আসত তারা প্রায়ই দেখতে পেত যে তাদের কলসীগুলি কে যেন জলের নীচ থেকে ভেঙ্গে দেয়। ক্রমে ক্রমে তারা অতিষ্ঠ হয়ে একসময় মহারাজার

কাছে এই সংবাদ দিল। এটা পরীক্ষা করার জন্য মহারাজা একদিন একটি নৌকা নিয়ে ছড়ার জলে খেলা করতে লাগলেন। তা দেখে বড় বোন বাচ্ছাদেরকে ঘাটে এসে রাজার নৌকার খেলা দেখার জন্য ডাকল এবং গান ধরল ঃ

"রাজা বৌঙ্গা বৌংমী-নখা উঠি নাই
ফাই চেরাইরগ্।"

সাত ভাই বোন তখন রাজার খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি এলো। রাজা এই সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে দেখে তাদেরকে যখন ধরতে গেলেন তারা তখন তাকে বলল যে তিনি যেহেতু দানব সুতরাং তাদেরকে যেন না ধরেন। রাজা তাদেরকে বললেন যে তিনি দানব নন, তিনি এই রাজ্যের মহারাজা। রাজা তখন তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা তাকে জানাল যে তারা রাজার সন্তান। রাজা তখন তাদেরকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং রাণীদেরকে মা ডাকতে বললেন। তারা তখন রাজাকে জানাল যে তাদের মা ছড়ার পারে ছাগল চড়াচ্ছেন। রাজা প্রথমে তা বিশ্বাস করলেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বাচ্চাদেরকে বললেন যে তোমাদের মা ছড়ার একপার থেকে তার স্তনের দুধ দিলে অপর পারে এসে যদি তোমাদের মুখে পড়ে তবেই বোঝা যাবে যে ঐ নারীই তোমাদের মা। শেষ পর্য্যন্ত এই পরীক্ষায় সাত ভাইবোনই জয়ী হল। তখন রাজা তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি খুব অনুশোচনা করলেন। ছোট রাণীর কাটা নাক ও কান তার বড়বোনের কাছে ছিল এবং সেগুলি এনে লাগিয়ে দেওয়া হল। ছোট রাণী আবার রাজার আদরের মহিষী হলেন। সব ষড়যন্ত্রকারী রাণীদের কৃত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হল। এই সাত ভাইবোনই পরবর্ত্তী রাজা হয়ে ত্রিপুরাকে শাসন করেছিলেন। আজও ত্রিপুরার রাজারা গোমতী নদীতে স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন, কারণ -রাজার স্ত্রীর বড়বোন এই নদীতে আছেন। এখন ও ত্রিপুরার জনসাধারণ গোমতী নদীর উৎসস্থল ডম্বুরকে তীর্থস্থান বলে জ্ঞান করেন।

চেথো্ওয়াং ফাংনি কক্তৌমা
(ছাতিয়ান গাছের গল্প)

অনেকদিন পূর্বে কোন এক কলই গ্রামে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে একজন বিধবা মেয়েলোক বাস করতেন। উভয়ের মধ্যে ছেলেটি বড়,মেয়েটি ছোট। তাদের বাড়ীর পাশে একটি ছড়া (পাহাড়ী নদী) ছিল এবং এই ছড়া পার হয়ে তারা প্রায়ই একত্রে জুমে যেত। একদিন জুমে যাওয়ার পর প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে ছড়া জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন তারা মাথায় 'পুজা' (মালপত্র) নিয়ে ফেরার পথে জলপূর্ণ ছড়া পার হতে সাহস পেলনা। ছোটবোন তার দাদাকে ছড়াটি আগে পার হওয়ার জন্য বলল কিন্তু বড়ভাই প্রথমে পার হতে সাহস পেলনা। তখন ছোট বোন

তাকে বলল যে, "দাদা, তুমি পুরুষ মানুষ সুতরাং তুমি প্রথমে ছড়াটি পার হও। আমি তোমার পিছনে আসব"। তথাপিও বড়ভাই সাহস পেলনা, সে ছোটবোনকে আগে পার হওয়ার জন্য বলল।

এদিকে ছড়ার জল ক্রমে ক্রমে আরও বেড়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা ছোট বোনই সাহস করে জলে নেমে ছড়া পার হতে লাগল। বড়ভাই তখন ছড়ার পার থেকে ছোটবোনের দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য্য দেখে মনে মনে ছোট বোনকে ভালবেসে ফেলল। তখন সে আর ছড়া পার হলনা এবং সেখানেই বসে পড়ল। এদিকে ছোট বোন তার দাদাকে আসার জন্য অনেক ডাকল, কিন্তু বড়ভাই ছড়ার পারে বসেই ভাবতে লাগল এবং সে আর বাড়ীতে ফিরল না। তার মা এসেও তাকে বাড়ীতে আসার জন্য অনেক করে বললেন। কিন্তু সে কোন কথাই বলল না। তার মা তখন মনে করলেন যে তার ছেলে হয়ত কোন মেয়েকে পছন্দ করেছে, তাই সে কথা বলছেনা। তখন তার বিয়ের কথা বলে অনেক বুঝিয়ে তার মা তাকে বাড়ীতে নিলেন।

বাড়ীতে যাওয়ার পর তার মা তাকে কোনো মেয়েকে সে পছন্দ করেছে কিনা তা বলার জন্য বললেন। কিন্তু সে কোন উত্তর দিলনা। এখন তার মা ঐ পাড়ার যত যুবতী আছে তাদের প্রত্যেকের নাম একে একে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে একজনকেও পছন্দ করলনা। সবশেষে যখন তার ছোটবোনের কথা বলা হল, তখন সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তার মা ছেলের অবস্থা দেখে এই বিয়েতে রাজী হলেন। এদিকে এই বিয়ের ব্যপারে ছোটবোন (আবিছাকন্যা) কিছুই জানতনা। এই ব্যাপারটা শুধু তার মা ও ঠাকুরমাই জানতেন। আবিছাকন্যার মা ও ঠাকুরমা বিয়ের জন্য ধান রৌদ্রে দিয়েছিল কিন্তু মোরগে ধান খেয়ে ফেলায় তার ঠাকুরমা রাগ করে বলল "নাতি নাতনী বিয়ে দেব, আর ধানগুলো সব মোরগ খেয়ে ফেলছে।" পাশেই তার নাতনী (আবিছাকন্যা) চুল বাধতে ছিল এবং সে ঠাকুরমার কথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করল যে সে কি বলছে। ঠাকুরমা তখন কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন এবং তাকে অন্যকথা বললেন।

ছোটবোন (আবিছাকন্যা) পরের দিন তার পাড়ায় অন্যান্য বান্ধবীদের মুখ থেকে তার দাদার সঙ্গে তার বিয়ে হবে শুনে খুব দুঃখিত হল। ক্রমে ক্রমে বিয়ের দিন ঠিক হল এবং বিয়ের দিন এগিয়ে আসল। বিয়ের দিন ছোটবোন (আবিছাকন্যা) তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে সুতাকাটার চরকাটাকে জলে ভিজাবার জন্য পার্শ্ববর্তী ছড়া (ছোট পাহড়ী নদীতে গেল)। তার বান্ধবী ছড়ার অন্য একটি ঘাটে তার চরকা ভিজিয়েছিল। সে তার (বান্ধবী) চরকা ভিজাবার কাজ শেষ করে বাড়ীতে ফিরার জন্য তার বান্ধবীকে (আবিছাকন্যাকে) ডাকল, কিন্তু আবিছাকন্যা তার কথার কোন উত্তর দিল না এবং সে ঘরেও ফিরল না। ছড়ার পারে একটি ছোট ছাতিয়ান (ছাতির মত দেখতে এক প্রকার

গাছ) ছিল। আবিছাকন্যা ঐ ছাতিয়ান গাছের উপরে উঠে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল, 'হে সর্বশক্তিমান ভগবান, তুমি আমাকে দাদার সঙ্গে বিবাহ থেকে রক্ষা কর। এই রকম বিবাহ কোন সমাজে হতে পারে না। এই ছাতিয়ান গাছ উঁচু হয়ে আকাশে গিয়ে লাগুক-এটাই আমার প্রার্থনা। আমি আকাশে গিয়ে থাকব।" সে আরও বলল যে দাদার সঙ্গে তার বিয়ে হলে ছাতিয়ান গাছটা যেন আরও উঁচু হয়।

তখন ছাতিয়াম গাছটি ক্রমে ক্রমে আরও লম্বা এবং উঁচু হয়ে উঠল। এদিকে বিয়ের সময় হয়ে যাওয়ায় তার মা তাকে খোঁজ করতে করতে তার বান্ধবীর মুখে শুনতে পেল যে তার মেয়ে ছাতিয়ান গাছে উঠে আছে। তখন মা গিয়ে তার মেয়েকে ছাতিয়ান গাছ থেকে নেমে আসার জন্য বলল এবং তাকে বিয়ে দেবে না বলে জানান। কিন্তু মেয়ে (আবিছাকন্যা) তাতে রাজী হল না। আবিছাকন্যা তখন গান ধরল-

আন্ দাদা বাই কাইমানি হিনমানি
লাউ চোতোয়াংফাং লাউ লাউ।।
আন্ দাদা বাই কাইমানি হিনমানি
টর চেথোয়াং টর টর।।
আন্ দাদা বাই কাইমানি হিনখলাই।
জাফাংগুমালা রাথারুই রফাদি।।

আবিছাকন্যা বলল যে, দাদার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হলে গাছের তলায় একটি শূকর বলি দিতে হবে, গাছের তলায় মদের কলসী বসাতে হবে এবং নতুন একথান কাপড় দিতে হবে। তখন শূকরের পরিবর্তে একটি বড় কাল কুকুর বলি দেওয়া হল, মদের কলসের পরিবর্তে শূকরের পচাময়লা খাবারগুলি দেওয়া হল এবং নতুন থান কাপড়ের পরিবর্তে পুরান এবং ছেড়া ময়লা কাপড়গুলি গাছের তলায় দেওয়া হল। ছাতিয়াম গাছটি তখন আরও উঁচু ও লম্বা হয়ে পড়ল।

তখন ছাতিয়ান গাছ থেকে আকাশে উঠার জন্য আবিছাকন্যা যমরাজাকে প্রার্থনা জানাল তাকে একটি স্বর্ণের মই (চকাম) দেওয়ার জন্য যাতে সে ছাতিয়ান গাছ থেকে চকাম (মই) লাগিয়ে আকাশে উঠতে পারে এবং তার দাদার সঙ্গে বিবাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে। গান-

যম্ রাজামা যম্ কাইথমা
আন যাখিলিক রহরদি।।
যম্ রাজামা যম্ কাইথমা
আন যাখিলিক রহরদি।।

তখন যমরাজা সোনার চকাম পাঠালেন এবং আবিছাকন্যা এই চকামে করে ছাতিয়ান গাছ থেকে আকাশে উঠে গেল এবং আকাশ থেকে চকামটা (মই) ফেলে দেওয়ার সময় ছাতিয়াম গাছের আগাটা (চুড়া) ভেঙ্গে গেল। এজন্য আজও ছাতিয়াম গাছের চূড়াটি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। আবিছাকন্যা আকাশে উঠার চিহ্ন স্বরূপ আজও আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় এবং এই বিদ্যুৎ আবিছাকন্যার শাড়ীর নাড়াচাড়া করার চিহ্ন হিসেবে কলই সমাজের বৃদ্ধ বৃদ্ধরা আজও তাদের নাতি-নাতনীদের কাছে গল্প বলে থাকেন।

ভূমিকম্প সম্পর্কে কলইদের প্রচলিত কিংবদন্তী

ভূমিকম্পকে কলইরা তাদের ভাষায় বাংলাই রাজা বসে। এই ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে কলইদের মধ্যে যে কিংবদন্তী আছে তাতে দেখা যায় যে, খিবুমা নামক এক প্রকার পোকা (এই পোকা দেখতে অনেকটা ভম্রা পোকার মত, এই পোকা মানুষের মল খেয়ে জীবন ধারণ করে) বাংলাই রাজাকে (ভুমিকম্পের রাজাকে) সব সময় জানায় যে পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি শেষ হয়ে গিয়েছে সুতরাং সে আর মল খেতে পারে না। খিবুমা পোকার কথা শুনে বাংলাই রাজা পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি আছে কিনা তা জানার জন্য মাঝে মাঝে পৃথিবীতে একটু নাড়া দিতে থাকেন। পৃথিবী কেঁপে উঠার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যগণ উলুধ্বনি দিয়ে থাকেন এবং তখনই বাংলাই রাজা বুঝতে পারেন যে পৃথিবীতে এখনও মনুষ্যজাতি আছে।

আকাশের উচ্চতা সম্পর্কে প্রচলিত রূপকথা

প্রাচীনকালে আকাশ নাকি খুব নীচে ছিল এবং মানুষ হাত দিয়ে আকাশ লাগাল পেত। তখন এক রাক্ষসী উদুখলে ধান বানতে গিয়ে মহা অসুবিধায় পড়ে গেল কারণ তার হাতের উদুটা (চেকাইট) বার বার আকাশে লাগত। তখন রাক্ষসী রাগ করে হঠাৎ হাতের উদুটা (চেকাইট) দিয়ে আকাশকে একটা খোঁচা দিল এবং তারপর থেকেই আকাশটা উপরে উঠে গেল।

কাওলিকা / কাওতাং

(প্রবাদ)

১। কাইছানি পূজা কুবাংনি লাঠা।
(একের বোঝা দশের লাঠি)

২। মায়ুং যাকব্রুই যাক্‌ছা কাপ্লে।
(হাতীও খাদে পড়ে)
৩। উাতৈ (ওয়াতৈ) ন আশাই রিগ্নাইয়ঃ স্তৈইয়ুঃ।
(বৃষ্টির আশায় কাপড়ে প্রশ্রাব করা)
৪। হুয়াচেংঙ্গ মাইরং সারু।
(উলুবনে মুক্ত ছড়ায়)
৫। ছায়ুক্‌ন ফ্রুংমি, হামযুক রুংগু।
(মেয়েকে বলে বৌকে শিখানো)
৬। তুই তুকুপাই তিয়ারি মাইরাং।
(স্নান করার পর সুন্দর পুকুর দেখা)
৭। থানচি কুতুং বকচা বালছা।
(উগ্রমেজাজের লোক একস্থানে থাকে না)
৮। তুই মাবু নাই-তুই রিগ্নাই-বু সুতুই।
(নদী ও দেখা, কাপড়ও ধোয়া অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করা)
৯। তুক তাগুইদ সুবাও তাকইয়াই তং।
(পাতিল যখন আছে তবে ঢাকনাও আছে)
১০। বুইনি বাগুই ওয়ারাই চাওখ্‌লাই স্বাকসিক্লাই থুইও।
(অপরের জন্য ফাঁদ পাতলে নিজেকেই আটকাতে হয়)
১১।। যাইতি ক্কাং মাই মাচায়া।
(আত্মীয় স্বজন বেশী হলে ভাল খাওয়া মিলে না)
১২।। মুফূ নায়া খ্‌লাই কেরাং ফানু নাদি, কেরাং নায়া খ্‌লাই কেরাং ফানু নাদি।
(গোসাপ না নিলে কচ্ছপ নাও আর কচ্ছপ না নিলে গোসাপ নাও অর্থাৎ জোর করে কাওকে কোন জিনিষ গছানো)
১৩। জক নাই থাটিয়া কতর।
(হারানো জিনিষকে বড় করে দেখানো)
১৪। বোসু বাই বোসু ন খাইও।
(কাটা দিয়ে কাটা খোলা)
১৫। রামনি শ্লাই রামায়ণ অক্রা।
(রামের পূর্বেই রামায়ণ রচিত হয়)

১৬। ওয়াক চোর হাই খাজনা রিয়া।
(উভয় দলে থেকে সুবিধা আদায় করা)
১৭। তাওমা তুই থান তাওলা অচাই।
(মুরগী ডিম পারতে গেলে মুরগা অচাইগিরি করে-অর্থাৎ অপরের কাজের উপর না বুঝেই সর্দারী করা)
১৮। চানাই তাওসি, বুজাক নাই রিজুং।
(একের পাপে অন্যের শাস্তি)
১৯। দামব্রা হোক তাং, চেথ্রা মুং থাং।
(একের কাজ আর অপরের নাম)
২০। খি নাই লাচিয়া সুগ নাই লাচিও।
(পায়খানা যে করল তার লাজ নেই আর যে দেখল তার লাজ)
২১। হাচেং খংঙ্গ তৈই লোও।
(অপাত্রে দান)
২২। খি মানি খিকরক্ সুয়া, খুপুইমানি শুনাই।
(কাজের সময় কাজ না করে অ-কাজের সময় কাজ করা)
২৩। থিনত্রই লাই মনকানু তুইয়া।
(তেঁতুল পাকলেও মিষ্টি হয় না)
২৪। চিবুবা থুইনা তুই, লাঠা বাইয়া না তুই।
(সাপও মরবে, লাঠি ও ভাঙ্গবে না)
২৫। মুছা বুড়া কুং বাহাই গ্নাং।
(বুড়া দাদাকে শিখাতে হয় না)
২৬। ওয়ালনক গান্ধারনি মুছু শম চায়া।
(গোয়াল ঘরের গরু গোয়াল ঘরের পাশের ঘাস খায় না অর্থাৎ বাড়ীর গরু বাড়ীর ঘাস খায় না)
২৭। ছেলের মাই কুরুই থেনতা হা কুরুই।
(আলসের ভাত নেই, ঝগড়াটের স্থান নেই)
২৮। বুথো লনমা হাই, যাক লনইয়া।
(কথায় পণ্ডিত কাজে ঠন্ ঠন্)

২৯। চরলে হান খায়া।
(কাটা কোন দিন মাংস হয় না বা পর কখনও আপন হয় না)
৩০। চানা খ্‌লাই সুই, খুবুই না খ্‌লাই সৈই।
(খাওয়া ও যায় না আবার ফেলাও যায় না)
৩১। পাল খ্‌লাই শাল।
(একতাই বল)
৩২। নখা নাই শাই খুকতুই মুশু খ্‌লাই শাগ ক্লাইয়ু।
(উপরের দিকে থুথু ফেললে নিজের উপর পড়ে)
৩৩। নখা সমাসিং ওয়াতৈই ফাইয়া।
(যত গর্জে তত বর্ষে না)
৩৪। লাজমান কুরুই বহক ওপোঙ্গো।
(লজ্জাহীনের পেট ভর্ত্তী থাকে)
৩৫। তুইছানি শ্লাই আরাং ক্লাও।
(ছড়া (নদী) থেকে মাছ বড়)
৩৬। চাওই সি রুং থাংগু সুংগুই সিকাও মানু।
(নৌকা বাইলে নৌকা চলে আর কথায় কথা বাড়ে)
৩৭। হলং কুচার নি তাওতুই।
(দুই পাথরের মাঝখানকার ডিম অর্থাৎ উভয় সঙ্কট)
৩৮। বাদুয়াবাই তাতাংদি, স্কাল বাই তংদি।
(কুটিল মানুষের সঙ্গ থেকে ডাইনীর সঙ্গ ভাল)
৩৯। বল সিত্রা থাপ্না ক্কাং, বরক সিত্রা কাগু কুবাং।
(খারাপ লাকড়ির ছাই বেশী হয়, আর খারাপ মানুষের অকাজের কথা বেশী হয়)
৪০। বুছা জাকংগ খিও খুনুই বাহান রাখাক গুই খ্‌বিই মানইয়া।
(ছেলে খারাপ হলেও ত্যাগ করা যায় না)
৪১। যাইতি ব্বগং মাই মাচায়া।
(আত্মীয় স্বজন বেশী হলে ভাগে কম পড়ে)
৪২। সুই কারুই বু মুই কারিয়া, মুই কারুই বু সুই কারিয়া।
(শিকারী ছাড়লে শিকার ছাড়ে না, শিকার ছাড়লে শিকারী ছাড়ে না)
৪৩। আক্রাকাও থাইছা বাড়া, চেরাই মাই ফাইছা বাড়া।

(বড়দের কথা মূল্যবান , ছোটদের বেশী খাওয়া মূল্যবান)

৪৪। গলা তৈই পুংইয়া তৈয় পুপাকগু।

(শূন্য কলসীর শব্দ বেশী)

৪৫। বরক কুথুই তিসাও, কাও খন্তাই মাচাও

মসু কুথুই তিসাও মাই কাহাম মাচাও।

(মানুষকে উপকার করলে অপকার করে, পশুকে উপকার করলে উপকার করে)

৪৬। বুইনি বাগুই ওয়ারাই চাও খ্লাই স্বাকসি ক্লাই থুইও।

(অপরের জন্য ফাঁদ পাতলে নিজে পড়তে হয়)

৪৭। তিয়ারি তুই খ্রেং চাও, তৈখ্রেং তিয়ারি চাও।

(সুখ দুঃখ চক্রের মত ঘুরছে)

কাওকুমাও মানি (ধাঁ ধাঁ)

১। সাগর কুচার পখ্লা ক্চাও -তাল।

(সাগরের মধ্যে ভাঙ্গা পাতিল-চন্দ্র)

২। তৈ রুকুং রুকুং মাওয়া বুভু-শিমালুক।

(জলের কিনারে পোকার বাস-শ্মশান)

৩। তৈই বিছিং বিছিং আবিছা মুথু-সারচেংচাংমানি।

(জলের মধ্যে ছোট শিশুকে ঘুম পাতানো-চাইপাতা)

৪। ব্রুইমা মাছা বখরক থাই তাম-থাপা।

(একজনের তিন মাথা-চুলা)

৫। পালই চাতি কাইছা-রাজা।

(সবাই মিলে একটি বাতি-রাজা)

৬। কদম ক্লিক্ ক্লিক্ কদম ক্লাক ক্লাক কদম পাল্কি রাজা-নখাক্লিক্ মানি।

(একবার দেখে একবার নেই-বিজলী)

৭। ঠং কক্ইয়া হাকর কক্- জাদিস্তাম।

(পাল্লা ছোটে না গর্ত ছুটে-আংটি)

৮। ব্রুইমা মাছা তাল খ্লাইখা খ্লাই ছয়কুড়ি ছয়জন মুছাও-মাই মৈইমি।

৯। বুমা কাপরু রুক বুছা তরোরুক-খুলতৈইলুমি।

(মা যত কাঁদে, সন্তান তত বাড়ে-চড়কার সূতা)

১০। খেরাং কুচু ওয়াখি ফ্রান-থিংওই

(প্রতিটি ঘরেই ছোট পাখীর বাসা-র‍্যাগ)

১১। চ্‌লাছা মাছা কুংছা বাচা বক্‌চা থলাইছা- তাওখৈই অনাংমানি

(দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুটলী ঝুলে যাওয়া-পাখী ধরার ফাঁদ)

১২। রাজানি পুখিরি কন্‌খ্‌লাই মানইয়া-মকল

(রাজার পুকুরে দাগ পড়ে না -চোখ)

১৩। রাজানি পাকুড়ি শরই শরপাইয়া-লামা

(রাজার পাগড়ি বেঁধে শেষ হয় না- রাস্তা)

১৪। রাজানি দুলাই ফ্রানুই রানইয়া-বুল্লাই

(রাজার লেপ রোদে শুকায় না-জিহ্বা)

১৫। জাকুং কুরুই, জাক কুরুই, দুনিয়া বেরাই চাও-চিঠি

(হাত নেই, পা নেই, দুনিয়া বেড়ায়-চিঠি)

১৬। নখা লাই গুরুক্ষো ওয়াতৈই ফায়া-দাবা

(মেঘের গর্জন কিন্তু বর্ষন নয়-হুকা)

১৭। নাই নুগছায়া তাংগুই জাসকগু-কপাল

(দেখা যায় না, তবে ধরা যায়-কপাল)

১৮। নাই নুগছাও তাংগুই জাসক ইয়া- নখা

(দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না-আকাশ)

১৯। শামলাই-তাংগু , বন্তন্থই ছা বাই

তবু মায়ুং লাই-অংইয়া,

কুথাংলাই-তংগু-আনি শামুবাই

কিকুংনি লাঠা-কাক্‌ইয়া-

ডিঙ্গি বা ঢেকি।

(শূর দিয়ে কর্মকরি নই আমি হাতী-, সর্ব্বলোকের উপকার করে খাই তবু লাথি= ঢেকি)

২১। নগ বিছিংতন নক বুছা = গুন্দার

(ঘরের ভিতরে ঘর -মশারি)

২২।থাং গিগ্রা-ফাই লাতুং তং-খিনা ঠাংমি

(যাওয়ার সময় তাড়াতাড়ি, আসার সময় ধীরে-পায়খানায় যাওয়া)

২৩। মুইপ্লেং ওয়াছোংতং খোও কোং খাপছা-

ওয়ারু- খুপুইমানি-

(চোঙ্গা-উল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে নাকে আঘাত

লাগা-বায়ুত্যাগ করা)

২৪। পুনমা দুধুড়ি খিক্রক-লামছিনি-সুমূল

(একটা ছাগলের সাতটা ছিদ্র-বাঁশী)

কলইদের বিয়ের গান

কলইদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই বিয়ের সময় বিভিন্ন প্রকার-গান গাওয়ার প্রচলন আছে। এই গানগুলি তাদের নিত্য নৈমত্তিক জীবন যাপনের বিভিন্ন উপকরণই নিয়ে গঠিত। অমরপুর মহকুমার যন্ত্রণা পাড়ার-৮৫ বৎসরের বৃদ্ধা এক কলই মহিলার কাছ থেকে তাদের বিয়ের-পর বিদায় কালীন(আইয়া বিদায়নি রূছাপমূং) সংগৃহীত একটি গান নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১নং -গান

অ-আইয়া বিদায়নি মাইচাবু জাগুইখা
অ- নখাসি গুরুমঐং অ গুরুম ঐ-।
ওয়াদে ওয়াইয়া পাসল থাংগানো নখা অ।
অ নখা সমাসিং ওয়াতে পয়াখ্লাই-
পৃথিবী তল চাওয়ানু।
অ-আইয়া বিদায়নি মাইচাবু জাখা-
অ- তখমাসি-দকার-সজাকলিয়ানা-
অ- তখমাসিরম জাকলিয়ানা,
অ-ধরলাই তক্মা রমজা-অ-খা
অ-নখা-গুরুম্ লাই-মাইকাই লাইয়া,
অ-মাইফাং তৈই তিলক-অংখা-
অ-ধনলাই লাই মাইয়া
অ-চেরায় ফাংছিনি নখ নালাইখে,
বছাছে তৈই তিলক-পাই খামুং।

অ-ধনলে অ-মাইয়লে

তংমসি তংসজাই তাংগু।।

(ভাবানুবাদ ঃ-এখানে গায়িকা বলছেন যে তিনি বিয়ে বাড়ী থেকে বিয়ের শেষে বিদায়ের পূর্বের ভাত খেয়ে এসেছেন। ভাত খেতে দেরী হওয়ায় আকাশে মেঘ গর্জন করছে এবং বৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা আছে। আকাশ যে ভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে সে পরিমাণে বৃষ্টি হলে পৃথিবী তলিয়ে যাবে। বিদায়কালীন ভাত খাওয়ার দেরী হওয়ায় বাড়ীতে মোরগের ঘরের দরজা লাগানো হচ্ছে না এবং তার শিশু (আদরের ডাক 'ধনলাই') মোরগগুলি ধরছে না বলে তার অনুমান হচ্ছে। আকাশে মেঘ গর্জন করার ফলে ধান গাছ লাগানো যাবে না। তার আদরের ছেলেমেয়েরা [ধনলাই মাইয়ালাহ] এখনো বোধ হয় তৈইতিলক [মাটির কূজোর-মত তারা লাউ এর ভিতর জল রাখে এবং এই পাত্রকে বলা হয় তৈইতিলক] জল তোলে নাই। এখানে গায়িকা বলছেন যে ছোটবেলা বিয়ে করলে [অর্থাৎ ঠিক সময়ে] তার ছেলেমেয়েরা এখন জল তুলতে সক্ষম হত। কিন্তু তার আদরের সন্তানদের যে এখনও কিছুটা পাগলামী [দুষ্টামী] আছে।)

২নং — গান

আইয়া বিদায়নি রুচাপ্ মোং

(বিবাহের পর আইয়া বিদায়ের গান)

অ—নখালে গুরুম ওয়ানাদে ওয়াগুরুমইদে

অ —পাসল থাংন।

অ— জান্‌বাই পিরীতি ব বাই নো

কেনা কাগুই মান গলাকনাও বাই

চিক্‌ন সারেঙা যাগ্‌বাই ভুলি তুই

ধন বাই চুং ভুলি না দোই।।

কিতিং কতাংনি বাইলেং ক্ষং

বাই বা তমা মাই মুংনো ক্ষুই নাই।।

কলাউকে ক্ষুই নাই কিতিং দে ক্ষুই নাই

ভবতুই মাই মুং ন্ ক্ষুই নাই।।

চুংলে ছিলাইয়া হরি বিবি, নাউত্তনি ধর্ম ইচ্ছা,

কিতিং ব্চাতে মাইতুক পাইয়া

তুখুছা পাইয়ই রি দি।।

কিতিং বছাতে তুই খগুই পাইয়া
লাংগিছা পায়ওই রি দি।
ন্খা কস্মোনি ওয়াতুই
তাওমা- কস্মনি তাও তুই
খা বিছিং বিছিং খা ওয়ান্সক্ খলাই
চিনি মকল মুকতুই।।

ভাবার্থ ঃ বিয়ের পর বিদায়ের সময় বিদায়ীরা যে ব্যথা অনুভব করছেন, এখানে এই বিদায়কালীন সঙ্গীতের মাধ্যমে তাই ফুটে উঠেছে। বিদায়ীদের পক্ষ থেকে গাওয়া হচ্ছে যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘের গুরু গুরু গর্জন করলেও বৃষ্টি হবে কি হবে না তা যেমন সঠিক ভাবে বোঝা যায় না, তেমনি এই বিদায়ের মুহূর্তে আমাদের বিষন্ন হৃদয়ও তোমাদের ছেড়ে যাব কি যাবনা ভেবে চিন্তিত হচ্ছে।

একজন সুদক্ষ সারিন্দা (বাদ্যযন্ত্র) বাদকের হাতে সারিন্দা যেমন মধুর লাগে এবং তার সুর মানুষের হৃদয়ে যেমন দীর্ঘদিন গেঁথে থাকে , তেমনি তোমাদের ভালবাসাও আমাদের হৃদয়ে মধুর স্মৃতি হয়ে গাঁথা থাকবে।

তারপর নববধূকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, গোলাকৃতির কুলা দিয়ে তুমি কি ধানের চাউল এবং কোন ধরণের চাউল ঝাড়াই করবে (অর্থাৎ তোমার কপালে কি আছে) তা আমরা জানি না। একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তাই (শ্রীহরি ভগবানই) জানেন।

এরপর বরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে অল্প বয়সের সুষমা মণ্ডিত ছোট এই নববধূকে ভাতের হাঁড়ি তুলতে না পারলে ছোট একটি পাতিল কিনে দেবে এবং কলসী দিয়ে জল তুলতে না পারলে ছোট একটি ঘট (লাংগি) কিনে দেবে।

গায়ক আবার বলছেন যে, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হলে যেমন কাল রং এর মোরগের ন্যায় কাল রং ধারণ করে, সেরূপ তোমাদের ছেড়ে যেতে আমাদের হৃদয়ও গভীর কান্নায় পড়েছে।

৩নং গান

কলই যুবক যুবতীদের প্রণয় গীতিকে বলে "ছিকলারগনি রূছাপ্ মুং"। যুবতীরা এখন ও যে সব প্রাচীন প্রণয়গীতি গেয়ে থাকে তার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হল ঃ-

অ - মা - অ - মা - মাইতুক কুতুঅ
অ - কাঠি মথাংগো।
অ - খাপাংনো সুবাছে মুথাক্
নখা গুরুম অ, ওয়াতৈ মুথাংগ।
অ - রাজানি দালান - দালান বাই পাকি।
দালান পাকি বা খলাই নাংবাই নাংবাই।

অ - ব খানদে নাংবাই।

অ - মা - অ - মা -

মাইতুক কুতুঅ, অ কাঠি মথাগো

অ - খাপাংনো - সুবাছে মুথাক্।।

[এখানে গায়িকা মাকে সম্বোধন করে বলছে যে ভাতের ডেক্ (ভাত রান্নার পাত্র)-এ আগুন দিলে যখন জল টগ্‌বগ্ করে ফুটে তখন একমাত্র হাতাই ডেকের ভিতরের টগ্‌বগ্‌কে থামাতে পারে। কিন্তু মনকে কে থামাতে পারে? আকাশে মেঘ গর্জন করলে বৃষ্টিই এই গর্জনকে থামাতে পারে। কিন্তু মনকে কে থামাতে পারে? রাজার বাড়ীর পাকা দালানও মনকে থামাতে পারে না। হে মা তুমিই একমাত্র মনকে থামাতে পার।]

৪নং গান

কলইদের মধ্যে যে সব প্রাচীন প্রণয়গীত প্রচলিত আছে তার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হল।

অ - আব্বাং - আব্বাং - আব্বাং,

আবাং-নো মৈত মানু

কুমার হা তাক্‌মানি হা বারা

আবাংলে হামানি বারা বা ঐ

মোতাইলে তাক্‌মানি হা বারা

আবাং হা মানি বারা নাদো

ঘাটি তৈই খগমানি তৈইতিলক

তৈইমত আবা মত্‌ম মানি বারা

তৈইসানি তৈই স্রাই-স্রাই

আবাং নোখলাই খা স্রাই-স্রাই।

[এখানে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে স্ব গতোক্তি করছে যে, তার প্রেমিকার কথা মনে পড়ছে। মৃৎশিল্পী মাটি দিয়ে যে রূপ সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য করে, সেরূপ তার প্রেমিকাও দেখতে খুব সুন্দর। মাটি দিয়ে দেবতার [মাতাই] প্রতিমা তৈরী করার পর অবশিষ্ট মাটি দিয়ে মূর্ত্তি তৈরী করলে যে রূপ সুন্দর দেখার তার প্রেমিকাও সেইরূপ সুন্দরী। ছড়ার জল [ছোট পাহাড়ী নদী] যেমন খুব স্বচ্ছ সেরূপ আমার প্রেমিকাকে দেখলেও আমার মন পরিস্কার হয়ে যায়।]

৫নং-গান

বিভিন্ন প্রকারের প্রেম-প্রীতির গান ছাড়াও দুঃখ ও বেদনার গানেও কলই লোক সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাদের বেদনার গানগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর হৃদয়ে যে ব্যথা অনুভূত হয়, তারই প্রকাশ পায় তাদের "বুছাই থুই মানি দুঃখ খা্লই রূছাপমুং" নামক গানগুলিতে।

হই - অমা - মা - মায়সংগ,
মায়ুংনি আগো জনম নখলাই।
অমা - মায়ুংনি অগো জনম না জাগৈ,
অমা - অবতার ফেরগ মানলিয়া।
অ - মায়সংগ - অ - মায়সংগ -
তক্‌মানি অগো - জনম নাখ্‌লাই অঞ্চবার ফেরাও অ - খা - মুন।
অ - মায়সংগ, অ - কুমারলে তুক তাগো।
অ - না - মায়সংগ তেরাওতে লিখি,
অ - মা - খাপাং বরই তংনাই, অ - মায়সংগ -।
হা-অ তংখ্‌লাই ওরিচাওয়ানো,
অ - না - মায়সংগ- ।
কুচু অ তনখ্‌লাই তাওলেং নো-বরসিতন-সিনাই।
অ - না - মায়সংগ, অ - না - মায়সংগ।
লাইবাই - ছুখলাই - কিচিক গানো-
অ - না - মায়সংগ, অ - মায়সংগ-।
চুমুই উড়িতৈ উড়িখা -।
খাপাং কবম উড়িমা - সুবাসি -
অ মাইয়সংগ -, অ মাইঅসংগ-।
খাপাংগো হলং রিখ্‌লাই লাংখ অ -
হলংসি ওরাও লাংছিদো-
অ - মাইয়সংগ - অ - মাইয়সংগ।
অ - না - মাইয়সংগ -।
খাপাংগ অ - হলং ওরাওইয়া -
অমা পাষাণছি-খালাংখা মোং-
অ - না - মাইয়সংগ -।

খুমুলে সলংনে দুঃতনতাই যেওই।
মাসিং শিয়ারি থাকমা খাসিয়া
খাপাং ভাবে মে থাকইয়া।

[**ভাবার্থ ঃ** এখানে স্বামীর বিয়োগ ব্যথায় শোকাকুলা স্ত্রী তার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করে বলছেন যে হাতীর (মায়ুং) পেটে জন্ম নেওয়াতে তার স্বামীকে (অবতার) সে ফিরে পেল না। (অর্থাৎ এখানে তার স্বামীর মৃত্যুর কারণকে বড় করে বলতে গিয়ে হাতীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে)। কিন্তু মোরগের (তকমা) পেটে জন্ম নিলে (অর্থাৎ কোন সাধারণ কারণ হলে) তার স্বামীকে ফিরাতে পারত। কিন্তু এখন আর তার স্বামীকে সে ফিরে পাবে না। তার মনটা এখন পাগলিনীর মত। এই মনটাকে মাটিতে রাখলে উঁই পোকা খেয়ে ফেলবে। উঁচুতে রাখলে চিল নিয়ে যাবে। সুতরাং কোথায় যে এই অশান্ত মনটাকে রাখবে সে আর খোঁজে পাচ্ছে না। সে তার সঙ্গীগণকে বলছে যে তার মনটাকে কলার পাতা দিয়ে বেঁধে রাখলেও পাতা ছিঁড়ে যায়। এই পাগল মনটাকে এখন কোথায় সে রাখবে। সাদা সাদা মেঘের টুকরাগুলি যেমন আকাশে উড়ে সেরূপ আমার মনও উদাসীনের মত উড়ছে। কিন্তু কে বুঝবে আমার মনের কথা? বুকের উপর পাথর চাপা দিলেও এই বেদনা ভরা হৃদয়কে চাপা দেওয়া যায় না। হে আমার সাথিগণ! বুকের ভিতর পাথর চাপা না দিলেও আমার বুক পাষাণ হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের বিষাক্তলতা কেটে দিলে যেমন প্রাণ উড়ে যায় তেমনি আমার স্বামী ও চলে গিয়েছে। শীত যেমন কখন চলে যায় তা বোঝা যায় না, সেরূপ আমার স্বামীও কখন চলে গিয়েছে তা বুঝতে পারি নি। মনের এই ভাবনার আর শেষ নেই।]

৬নং - গান

কলইদের মধ্যে প্রচলিত আর একটি দুঃখ ও বেদনার গান হল ঃ

অ - আমা -, অ - আমা - আমা -।
বসমতি নো বাহাইছে বানাওখা -
বদিন অ বানাওখা - নারায়ণ।
অ - হরবাই - তৈই - বাহাইছে বানাওখা, আমাঐ।
ব-দিন অ বানাও লাংখা নারায়ণ আমাঐ,
অ - আমায় ঐ মাতা পিতা তুই জগত অ কুরুই আমায় ঐ।
অ - আমায় ঐ রাং কুতুই কিতিং কুরুই - আমায় ঐ।
অ - আমায় ঐ সাজুকলে বাংমাসিং সা লক্ষ্মী কুরুই -।

অ - আমায় ঐ - খুমুসুক বাংমাসুং চন্দনফাং কুরুই আমায় ঐ।

অ - আমায় ঐ- বাওঐলে রিখাদ মাইয়ানি সারক।

অ - আমা - চুংতৈ দুঃখিত বগন অ - আমায় ঐ।

চুংতৈ দুঃখিত অগো - তংমাঝ - অ - আমায় ঐ।

মাইতুকলে তুখুবাই - বাও ঐ - চা খনা -

চুং কিছা - যবর দুঃখঅংখনা - আমায় ঐ।

[**ভাবানুবাদ ঃ** এখানে গায়িকা বেদনাভরা কণ্ঠে বলছে যে মাতাপিতার মত এজগতে আর কেউ নেই। বনের অনেক গাছের মধ্যে চন্দন গাছ যেমন খুব কম পাওয়া যায় ঠিক তেমনি এই পৃথিবীতেও অসংখ্য মানুষের মধ্যে লক্ষ্মী ছেলে (সালক্ষ্মী) একটিও নেই। এজগতে তার মত দুঃখী আর নেই মায়ের উদরে থাকতেই তাদের দুঃখ ছিল বলে মনে হয়। ভাতকে যেমন ডেক্ (ভাত রান্নার পাত্র) দিয়ে সেদ্ধ করে খাওয়া হয়, এই পৃথিবীতে দুঃখ-বেদনাও তাদেরকে সেরূপ দহন করছে।]

৭নং গান

কলইদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাদের 'জুম' চাষ। এই জুমকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রচুর গান রচিত হয়েছে। জুমের তিল, কার্পাস ইত্যাদি তোলার সময় কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা যে সমস্ত গান গায় সেগুলিকে তারা বলে "খুল খলমানি চিপেং তনমানি রুচাপ্মুং"। নিম্নে এরূপ একটি গান দেওয়া হল ঃ

অ - অ - মাইঅ -।

অ - হাদুক অ কাইয়ো দাগা মাসিংগা

অ - অংখার অ মোংঅ কইরুম কইরুম।

অ - যাদুসংগ -।

অ - মায়ো - অ - তিনিসি,

দাংদাল অ রি কুফুরণুণ।

অ - প্রানলে যাদুসংগ হুগফাই খনা নাদো।

অ - মায়সংগ, মাইয়অ সংগ।

অ - না - মায়সংগ।

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতির মত কলইদের মধ্যে জুমের গান প্রচলিত আছে। এই জুমের গানকে তাদের ভাষায় বলে 'হুক্ হাওনা থাংম্য্ রুচাপলাইমানি'। নিমু তাদের মধ্যে প্রচলিত এরূপ একটি গান দেওয়া হল ঃ

অ - আগন হুক্ হাওইদে অ চৈত্র হুক্ ছাওইদে
অ - বসর মাই খ্প চা চানো
অ - আগনছে হাওয়ই চৈত্র হুক ছাওয়া ওয়ারেং
তাউকুলা বাইয়া
অ - গোলযুং মুরুইছে অ- দা হুলুই মানো
কুনুই খা বাগ্ছা খলাই
অ - লাইফাংতান ওই বো হর মোয়ই মানো
কুনুই খাপাং খা বাগ্ছা খ্লাই।।
চুং কুনুই কুনুই লামা হিম খলাই
চন্দে বুই কুনুই হিন্ অ।
তুইছা তুই কলাউ ওয়ানাল
যেং কলাউ তাকলাই বসর কলাউ
অ - কুনুইমা কাইছা - রিয্লাই নানি
অ - তবিসা সাষ্ বোয়া দুই।।
অ - কুনুইলাই - ফা কাইছা
রিষ্লাই নানি, বরত সায্ বোয়াদুই
অ কুনুই লা জাম কাইছা
থুষ্লাই নানি ছুইনাই কাইথর দে ছুইয়া।।

[ভাবার্থ ঃ এখানে যুবক-যুবতীকে উদ্দেশ্য, করে বলছে যে অগ্রহায়ণ মাসে জুম কাটার পর এবং চৈত্র মাসে জুম পোড়ানোর পরই তারা এ বৎসর-এক মুঠো ভাত খেতে পারবে। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে জুম-কাটার পর এবং চৈত্র মাসে জুম পোড়ানোর পরও অনেক কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

দুইজনের মধ্যে অন্তরের মিল থাকলে যে কোন অসম্ভব কাজও সম্ভব করা যায়। যেমন গর্জন গাছকে দা দিয়ে কেটে ঐ গাছেই দা ধার দেওয়া যায় এবং কলাগাছকেও পোড়ানো যায় সেরূপ আমরা দুজনও যদি একাত্ম হয়ে আত্মবিশ্বাস রেখে চলি তাহলে আমরাও যে কোন অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে পারব।

এ বৎসরটা যুবকদের কাছে যেন আর শেষ হচ্ছে না। একথাটা বোঝানোর জন্য সে একটি উপমা দিয়ে বলছে যে, ছড়া (পাহাড়ী নদী) যেমন পাহাড় বেয়ে নেমে লম্বা হয়ে ঢালুর দিকে চলে যায় এবং ওয়ানল (একপ্রকার লম্বা গাঁটযুক্ত বাঁশ) বাঁশের গাঁট যেমন লম্বা হয়, সে রূপ এ বৎসরটা যেন তার (যুবকটির) কাছে

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর লাগছে। সে স্বগতোক্তি করে বলছে, তাহলে ভগবান কি আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে, একই সঙ্গে কাজকর্ম ও ঘর সংসার করতে দেবে না ? তবে আমরা কি পরস্পরকে পাওয়ার জন্য পূর্ব জন্মে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নাই ? তার কিছুই বুঝতে পারছি না।]

গড়িয়া পূজার গান

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর ন্যায় কলইরাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে "গড়িয়া" পূজা করে। এই গড়িয়া পূজার সময় কলই গ্রামগুলি নৃত্যগীতে মুখর হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে কলইদের গানের সঙ্গে, ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া ও রিয়াংদের গানের যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। গড়িয়া'র প্রতিকৃতি নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে কলই যুবকরা দলবেধে গৃহস্থকে জানিয়ে দেয় এই বলে

আইলামরে - আইলামরে -
গড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়, ঘর গৃহস্থী হজাগ কর।
গড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়, দেশে দেশে বইত চায়।
টিলা টংকর ভাঙ্গিয়া ,ছাপছড়া শুকাইয়া -
গড়িয়া রাজা ঢোল বাজাইল উজির নাম।
খরগ আইছে - বানাইয়া।
গড়িয়া রাজা বইতে চায় আগুন পানি তৈয়ার কর।
আইলামরে - আইলামরে।
গড়িয়া রাজা বইতে চায়
অরে খেরেং বাই
মোরগ পাইলে কাটিয়া দে,
ডিম পাইলে গড়িয়ায় দে
সোনা রূপা বরবরাইয়া
ধানস তা বরবরাইয়া
টাকা পয়সা বান্দিয়া।

তারপর সবাই গোল হয়ে নাচে এবং ভঙ্গিমা করে বলে

ভালরে ভালরে ভাল,
ঠ্যাং তুলিয়া নাচ।

ঢাকের তালে তালে তারা বিভিন্ন প্রকার গান গেয়ে থাকে

মা চাইয়া ব ফাইয়া

মা নুংয়া ব ফাইয়া
অঃ বাঈলে নাইখলায় তংনায়।
ব ন নাই নাছে ফাই অ,
ভালরে ভাল ভাল।

গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে কলইদের মধ্যে অনেক হাস্যরসের গান ও গাওয়া হয়

ঐ গড়িয়া ঐ
অ গড়িয়া ঐ
চিনি পাড়ানি - সিকলারগ-
সিতওয় লোপে পেই
আতুকা বখর লোপে
আতুকা বখর লোপে
আতুকা বখর লোপে
চিনি পাড়ানি সিক্‌লারগলে
সিতত্তর লোপে পেই।।

'গড়িয়া' পূজার নৃত্যগীতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে 'খাম' (ঢোকল) বাজানোর বিভিন্ন প্রকার তাল বা বোলেরও প্রচলন আছে। নর্তকেরা যখন নাচে তখন 'খাম' এর (ঢোলকের) মধ্যে যে সমস্ত তাল বা বোল ফুটে উঠে সেগুলি হল-

১। লাস-

গান্ কি ঘাঘান ঘিচন্ গান
চন্ গান্ গান্ ঘিচন ঘিচন্
ঘিচন চুগান ঘিচন গান্
চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

২। তক্‌মা-মুই-ক্রাকমানি-

গানি গান ঘান্ চন্ চন্
চুগান্ গাগান্ চন্ চন্

গড়িয়া রাউনি রুচাপমোং

(গড়িয়া পূজার বিবিধ গান)

১। অ - মায়া চৈত্র থাংকা বা
বৈশাখ্ ফাইফি খা বছরসন্ ফিরাউ ফিখা।
অ - খনজন্ থাংকা বা, তিলিয়া ফাইখা

বছর সন ফিরাউ ফিখা।।
অ - মায় ,জাক্‌নিছি, দা সড়া
তাউচিং করং বাই তাংগুই চানানি নাং নাই।।
অ - মায়, অ - তিনিলে সালছা ছি।
অ - রঙ্গ তামছা খনালে মাই চু চুছা।।

উপরোক্ত গানটি গড়িয়া পূজা আরম্ভ হওয়ার দিন থেকে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন গাওয়া হয়।

ভাবার্থঃ এখানে গড়িয়া দেবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে বৎসরের শেষ ভাগে যেমন 'খনজন' পাখি চলে যায় এবং 'তিলিয়া' পাখী আসে সেরূপ চৈত্রমাস শেষ হওয়ার পর বৈশাখ মাস ফিরে এসেছে। এভাবে বৎসর শেষ হওয়ার পর আবার নূতন বৎসর ঘুরে আসে। আজকের দিনটি খুবই খুশীর দিন, এই এক দিনের জন্যই এত আনন্দ, কিন্তু কালই ভাতের মুচা নিয়ে জুমের কাজে যেতে হবে। আগামীকাল এই দিনটি আর খোঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদ চক্রাকারে ঘুরছে।

২। গড়িয়া বিসর্জনের গান ঃ

অ - সাল বোথাং রু রুগ্
মকল কাই রুরুগ্
তিনি তংগু লাক্ না-ধু।।
অ - গোলযুং তান ফাই য়ই।
যাথুরাই বাদি মামা জাক্ তলুই তুইদি।।
যান্ কইলি সং।।

(এই গানটি গেয়ে গড়িয়া বিসর্জন দেওয়া হয়)

ভাবার্থ ঃ এখানে গড়িয়া দেবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে দিন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, দিন চলে যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, গড়িয়া দেবতার চোখেও ক্রমে ক্রমে ঘুম আসছে। গড়িয়া দেবতা বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 'গোলযুং ফাং' (এক জাতীয় গাছ) কে কেটে সেতু তৈরী করে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে যাব। হে আমার সঙ্গীগণ, আজ আমাদের গড়িয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন দেব।

৩। গড়িয়া বিসর্জ্জনের পরের গান ঃ

অ - জালাই সাও চাদি
থেরায় বাঁচা থুন,
অ - কাঙাল মুই কুথুং মান্ থুন্।
অ - জালাই সাও চাদি

অ - থেরায় বাচা থুন্

অ - কাঙাল মুই কুথং মান্ থুন্।।

[গড়িয়াকে বিসর্জন দেওয়ার পর ফেরার সময় এই গান গাওয়া হয়]

'জালাই' এ (অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকায়) যেমন 'থেরায়' গাছ (এক জাতীয় গাছ যা সাধারণত সমতল ভূমিতেই জন্মে, এই 'থেরায়' গাছ পুড়লে প্রতিবৎসর নূতন করে এই গাছ জন্মে।) পোড়ে দিলে নূতন করে জন্মে সে রূপ গড়িয়া দেবতাকে বিসর্জন দেওয়ার পর নূতন বৎসরকে যেন আবার নূতন করে পাই।

চুরাই মুথুমানি রুচাপ্‌মোং

(ঘুম পাড়ানির গান)

অ - হে বাবুলে থুয়ইছে
মাই মা চাও থুয়াই মাই মা চাইয়া বাবু
হে বাবুলের ওয়ারেং ধুক নারনাই দুক কুরুই
ধুক নারনাই বেগারী কুরুই বাবুলে
থু-যাদি দ।
বাবুলে ধুক্ নারনাই, ধুক বেগারী কুরুই
বাবুলে থুযাদি দ।

[**ভাবার্থ ঃ** এখানে শিশুকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, হে বাবুধন তুমি ঘুমালে ভাল ভাল খাবার পাবে, না ঘুমালে পাবে না। তোমার দোলনার দড়ি টানার জন্য কোন লোক নেই, অতত্রব তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়।]

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মনীতি

কলইদের চিরাচরিত লোক ধর্ম মূলতঃ আচারমূলক ক্রিয়ানুষ্ঠান সর্বস্ব। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির যে দর্শন আছে তার সঙ্গে কলইদের এই চিরাচরিত লোক ধর্মের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। ধর্মের ব্যাপক লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করা, ফলের আশা না করে কর্মকরা, ঈশ্বরের কৃপালাভ করা, মুক্তিলাভ করা ইত্যাদি। এদিক থেকে কলইদের চিরাচরিত লোক ধর্মের (ওয়াথপবাদের) এরূপ বৃহত্তর কোন লক্ষ্য নেই। তাদের ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি কোন আকস্মিক বিপদ, অজানা দুর্ঘটনা, অসুখ বিসুখ, ও বিভিন্ন প্রকার অশুভশক্তির কুদৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বা আরোগ্য লাভ করার জন্যই বিশেষত করা হয়। এই পূজাগুলি সাময়িক বা আপতকালীণ। এগুলির মাধ্যমে আসন্ন ফল পাওয়া গেলেও স্থায়ী ফল সাধারণত পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিগুলির মত কলইরা ও একাধিক দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা দেওয়া হয়। তবে তাদের দেবদেবীগণের প্রতিকৃতি মাটির পরিবর্ত্তে বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয়। কলইদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে প্রাচীনকাল থেকেই যেমন এই বাঁশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তেমনি তাদের পূজাপার্বনে এই বাঁশের যথেষ্ঠ গুরুত্ব আছে। কলইদের চিরাচরিত পূজাপার্বণগুলির অঙ্গ হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়াথপ্ পূজা দেওয়া হয় এবং এই ওয়াথপ্ বাঁশ দিয়েই তৈরী করতে হয়। কলইদের এই ওয়াথপ্ পূজার নামকরণটিও ককবরক শব্দ ওয়া = বাঁশ এবং বথপ = পাখীর বাসা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য এখানে থপ্ শব্দটি দেবতার বাসা (বেদী) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন।

কলইদের চিরাচরিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির বৈশিষ্ঠ্যের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের আচার নিয়মগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হিন্দুধর্মে নিরাকার উপাসনার পাশাপাশি মঙ্গলচণ্ডীপূজা, ত্রিনাথের পূজা, গাড়ৈ পূজা, তপাপূজা, রূপসী পূজা প্রভৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত আছে। এই সমস্ত আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজা পার্বণের সঙ্গে সর্বভারতীয় হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোন মিল নেই। হিন্দুধর্মের এইসব আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজাপার্বনের উৎপত্তিতে ভারতের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারে J.H. Hutton এর উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Hutton লিখেছেন যে,'It is diffcult to draw a line of distinction between Hinduism and the Tribal religion and the latter presents a kind of surplus material which has not been built into the temple of Hinduism. This material is very similar to that which was used in building up Post-Vedio Hinduism. (Hutton J.H, Census of India 1931, India Report, Vol. 1, Part I, Page 391-98).

ধর্মের দিক থেকে কলইরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এ ব্যাপারে অনেকে মনে করেন যে ভারতের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির ন্যায় কলইগণও তাদের পাশ্ববর্তী অ-উপজাতি হিন্দুদের প্রভাবে হিন্দু (Hinduized) হয়েছেন। কিন্তু এরূপ কোন সিদ্ধান্তের আসার আগে চিন্তা করা প্রয়োজন যে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির মত হিন্দু ধর্মের প্রবর্ত্তক কোন একজন ব্যক্তি নন, এর উপাস্য দেবতাও এক ঈশ্বর নন এবং এর উপাসনারও কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এই ধর্মে বিভিন্ন উপজাতিগুলির চিরাচরিত পূজা-পার্বণগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মত কলইরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে না বলে এতটুকু বলা যায় যে তাদের পূজা-পার্বণগুলি হিন্দু ধর্মকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে কলইদের চিরাচরিত ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। J.A. Baines এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে The distinction between the tribal people who were Hinduized and those that followed their tribal form of religion as futile. (Baines J.A. 1891/ Census of India 1891 Report Page 158).

কলইগণ তাদের পার্শ্ববর্তী অ-উপজাতি হিন্দুদের প্রভাবে হিন্দু হয়েছে বললে ভারতের বিভিন্ন জাতিগুলিকেও হিন্দু হয়েছে বলার প্রয়োজন হবে। শুধুমাত্র ওয়াথপ পূজা বা কলইদের চিরাচরিত ধর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্যে পৌছার ব্যবস্থা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ না থাকায় উপজাতি হিন্দুরা যেমন গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করে ঠিক তেমনি অ-উপজাতি

হিন্দুরাও তুলসী -গাছ, রূপসী গাছ, বট গাছ, বেল গাছ প্রভৃতি বৃক্ষ পূজার পাশাপাশি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে থাকে।

কলইদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অ-উপজাতি হিন্দুদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। অনেক ব্যাপারে তাদের প্রভাব অ উপজাতি হিন্দুদের উপরও পড়েছে। কলইদের গড়িয়া পূজা, কের পূজা, তৈবুসুয়ামানি, মাইকাতালচামানি, মামিতা, মাইলুংমা, চুয়াকখানমানি ইত্যাদি বিভিন্ন চিরাচরিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে অ-উপজাতি হিন্দুদের মহাদেব (শিব) পূজা, কালীপূজা, নবান্ন উৎসব, গঙ্গা পূজা, গণেশ পূজা, লক্ষ্মী পূজা, বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতির উদ্দেশ্যের যথেষ্ট মিল আছে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উৎপত্তিতে উপজাতিদের যথেষ্ঠ অবদান আছে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর অভিমত হল- The indigenous population of India might have Contributed in the past generously to the building up of what is known as Hinduism. (Bose. Nirmal Kumar; 1971: Tribal Life of India, Page-6)

হিন্দুদের উপাস্য দেবতা 'শিব' মূলত ঃ বড়োদের (Tibeto-Bur-mese group এর) উপাস্য দেবতা ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। এ ব্যাপারে Bodo-দের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রাচীন কাহিনীতে আছে যে "Obonglouree, the infinite God (or The Eternal) became tired of his Formlees existence and so he desired to express Himself by taking a form of flash and blood. He did as he desired and shaped Himself into a lively human being, and called Himself Jiw Bo'rai or Si Bo'rai.

This part of the story tells us about how Obong laoree of the Eternal God after taking a human form named himself Jiw-Bo'rai or Si-Bo'rai. In Bodo 'Jiw' and 'Si' means 'life' or 'soul', and so the Bo'rai (The first holy man) possessing the first human life of soul is Jiw Bo'rai or Si Bo'rai. Probably the word 'jiw' later on led to the corruption 'Siw' and 'Siw' again led to the corruption of Siwa and then of sanskritised 'Siva' in the long run. In the context of this story the Bodos are aware of how the emergance of 'Jiw' Bo'rai or Siw Borai whatever they say is related to the possession of first human soul. In Hindu philosophy also, the emergance of the great God 'Siva' has some relation to the possession of first human life of soul which is asserted by the saying 'Joto, Jiwa toto Siva. If this analysis is some how appreciated there is left little room to doubt the fact that the Bodo

Jiwa Bo'rai or Si Bo'rai is the sanskritised Siwa or Siva. (Sri Ramdas Basu matary : Some ideas on 'Bathou' : Bodosa Page 29).

কলইদের ধর্ম প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তাদের মধ্যে এক ভক্তি আন্দোলন শুর হয়েছিল। যার প্রভাব তাঁদের চিরাচরিত ধর্মজীবনে ও প্রতিফলিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী 'ত্রিপুরা সন্ত চরিত মালা' নামক পুস্তকে তার কিছুটা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে জম্পুইজলা এলাকায় সাধু সন্তদের আশ্রয়স্থল হিসাবে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম (অ ঃ ১৮৯০ খ্রীঃ) মুরারী দাস ব্রজবাসী গোস্বামী ও মানকি দাস ব্রজবাসী গোস্বামী কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। দয়ালগুরু হীনদাস সিদ্ধান্তরী এই আশ্রমে ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমণ করেন।

হীনদাস সিদ্ধান্তরী জন্ম গ্রহণ করেন সনাতন ঠাকুর পাড়ায়। তাঁর পিতার নাম ঠাকুর সনাতন দেববর্মা। হীনদাসের দীক্ষাগুরু কে তা জানা যায়নি। তবে তিনি শাক্তমতে দীক্ষিত ছিলেন ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি উত্তরের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। তিনি জম্পুইজলা ও টাকার জলা ঘুরে বেড়াতেন ও প্রকৃত ভক্ত পেলে কথা বলতেন। তিনি বড় বড় রুদ্রাক্ষমালা গলায় ধারণ করতেন। তাই তিনি মালাকতর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাতের ত্রিশূলকে মাটিতে পুঁতে সোজা খাড়া রেখে ত্রিশূলের গলায় সোই মালা রাখতেন। লোক বিশ্বাস যে সাধনা বলে সেই জপমালা আপনা আপনি অবর্তিত হত। তিনি সহজে কাউকে দীক্ষা দিতেন না। উপযুক্ত পাত্র না পেলে যত্রতত্র যাকে তাকে মন্ত্র দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি মাত্র দুইজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন — একজন হলেন শ্যামরায় আর অন্যজন হলেন বৃহদাস সিদ্ধান্তরী। শ্যামরায় শেষকালে গুরুর সেবাযত্ন করেছিলেন। মালাকতর গৌরাঙ্গ সেবাশ্রমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এবং এই আশ্রমেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই ভাবে বহু সাধু সন্তদের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট গুলোর সঙ্গে স্থানীয় লোকেরাপরিচিত ও আকৃষ্ট হন। বর্তমানে শ্রী শক্তিমনি কলই এবং শক্তিদাসী পূজাহরি এই আশ্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যামন্দির মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত উচ্চএ্যেবিদ্যালয় ঐ এলাকার শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য গড়ে উঠে। এই স্কুলে ছেলেদের জন্য ১টি ও মেয়েদের জন্য ১টি হোস্টেল আছে। বর্তমানে ১৩৯ ছাত্রছাত্রী ঐ স্কুলে লেখাপড়া করেন।

পূজা পার্ব্বণ

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলইদের ধর্মীয় ব্যাপারে ও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীও আছেন। তবে কলই সমাজের সামাজিক পূজা হচ্ছে ওয়াথপ। ওয়াথপ্ পূজার মাধ্যমে অন্যান্য পূজা দেওয়া হয়। ওয়াথ্‌প পূজা অচাইর মাধ্যমে করতে হয়।কলই সমাজের প্রতীক হচ্ছে 'মায়ুংসা—করাইসা'। তাছাড়া, সার্বজনীন হিসাবে গ্রামে গ্রামে গড়িয়া পূজা, ঘরে ঘরে মাইনুকমা পূজা, গ্রামে গ্রামে কের পূজা ইত্যাদি করা হয়। আবার খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন ও গুড্‌ফ্রাইডে পালন করে। অনেকে দূর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদিও করেন। প্রত্যেক অগ্রাহায়ণ মাসের পূর্ণিমার আগের দিনে সমাজপতি রায়ের বাড়িতে সমগ্র কলই সমাজের বার্ষিক কের পূজা এবং 'রায়' রাশমানির উপলক্ষ্যে বলংসুয়ামানি পূজা করা হয়।

কলই সমাজে যে সমস্ত পূজা পার্বণ প্রচলিত আছে তার কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল ঃ

গড়িয়া পূজা ঃ- চাঁদা তুলে গ্রামের চৌধুরীর বাড়ী অথবা খেরপাং এর বাড়ীতে তারা সম্মিলিতভাবে এই পূজা করে। গড়িয়া সাধারণত বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ বুইছু দিন থেকে আরম্ভ হয়ে বৈশাখ মাসের ৭ তারিখ অর্থাৎ সেনা পর্য্যন্ত চলে। কলই সমাজে গড়িয়া পূজা বুইছুর দিন সন্ধ্যার সময় পাড়ার সব ঘরে ঘরে তাওতাই খাংমানির মাধ্যমে সবাইকে গড়িয়া আগমনের বার্তা জানিয়ে দেয়। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় খেরপাং-এর বাড়ীতে পাড়ার সবাই সমবেত হয়ে বিশেষ করে যুবক যুবতিরা কল বা ত্রিশূলের মধ্যে কলইদের নিজস্ব রিসা কুফুর বেধে উঠানের মাঝখানে পুতে দিয়ে পূজা দেওয়া হয় এবং ইহাকেই গড়িয়া হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। এই পূজা ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে একজনে নিজ বাড়ীতেও করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে করলে সে তিন বৎসর অথবা পাঁচ বৎসর এক নাগাড়ে করে। বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে সেনা পূজা পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাত দিন এই পূজা হয়। দিনের বেলায় অথবা সন্ধ্যায় নদীতে গড়িয়া বিসর্জন দেওয়া হয়। গড়িয়া বিসর্জনের পর সেনা পূজা ও মাইলুমা (লক্ষ্মী) পূজা দেওয়া হয়। এই গড়িয়া পূজাকে উপলক্ষ করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যগীতের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এই গড়িয়া পূজা ত্রিপুরার জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আড়ম্বরের সঙ্গে করা হয়। গড়িয়া বিসর্জনের দিন কলই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের বাড়ীতে নক্‌সু ও মাইলুংমা আছে, তাদের বাড়ীতে অচাইর (পুরোহিত) সাহায্যে এই পূজা করা হয়।

গড়িয়া পূজার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্তগণ হলেন — (১) খেরপাঙ ঃ যার বাড়িতে

গড়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেই বাড়ির কর্তাকে খেরপাঙ বলে। খেরপাঙ তিন বৎসর পর পর পাড়ার লোকেরা সর্বসন্মতিক্রমে নির্বাচন করে। খেরপাঙ হতে হলে অবশ্য সমাজে সন্মনিত ব্যক্তি হতে হবে। (২) দাগিয়া ঃ যিনি গড়িয়াকে বহন করে নিয়ে চলেন তাকেই দাগিয়া বলে। দাগিয়াকেও সর্বসন্মতিক্রমে তিন বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। (৩) দরিয়া ও মরিয়া ঃ যারা গড়িয়া পূজায় খাম বাজায় তাদেরকে দরিয়া ও মরিয়া বলে। যারা ভালভাবে খাম বাজাতে পারে তাদেরকেই এই পদে নির্বাচিত করা হয়।

কের পূজা ঃ- কলই সমাজের নিয়ম অনুযায়ী বৎসরে অন্তত একবার কলই রায়ের বাড়ীতে কের পূজা অবশ্যই করতে হয়। তাদের বিশ্বাস এই পূজায় সমাজের সকলের মঙ্গল হয়। অবশ্য কোন বিশেষ কারণে যদি একবার রায়ের বাড়ীতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হতে না পারে তবে তা আলাপ আলোচনা করে পরবর্তীকালে কোথায় হবে তা ঠিক করা হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে (অমাবস্যা দিন) অথবা সেই মাসের শেষের দিকের শনিবার বা মঙ্গলবারে এই পূজা করা হয়। রায়ের বাড়ী ছাড়া কলই গ্রামগুলির চৌধুরীদের (গ্রামের প্রধান) বাড়ীতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সব বাড়ী থেকে চাঁদা তুলে এই পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এই পূজার জন্য প্রত্যেক বাড়ী থেকে এক বোতল করে আরাক (মদ) ও লাঙ্গি দেওয়া হয়। পূজার দিন গ্রামের সব লোক চৌধুরীর বাড়ীতে আসে। এই পূজায় নদীতে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ঐদিন গ্রামের সবাই চৌধুরীর বাড়ীতেই ভোজন করে। অচাই (পুরোহিত) দিনের বেলা নদীতে ওয়াথপ্ তৈরী করে পাঠা বলি দেয়। এই পূজা যেদিন হয় তার পরের তিন রাত্রি এই গ্রামের কোন বসবাসকারী অন্যত্র রাত্রি যাপন করতে পারে না। পূজা চলাকালীন কেউ গ্রামের বাইরে যেতে পারে না এবং বাইরে থেকে কেউ গ্রামে প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও নিষেধ আছে। এই পূজার আগের দিন গ্রামের সীমানায় বাঁশ দিয়ে খং তৈরী করে দেওয়া হয়। পূজার দিন রাত্রিবেলা একটি বাঁশের চোঙ্গার ভিতর কিছু দেশজ ঔষধপত্র (মন্ত্রপূতঃ গাছের শিকড়) গ্রামের চার কোণে পুঁতে দেওয়া হয়। তাকে তারা মুদ্রা বলে।

তারপর একটি বাঁশের অগ্রভাগে ঐ চুঙ্গাটাকে জুমের তৈরী সূতা (খুলতৈ) দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এই মুদ্রা পূজা রাত্রিবেলা হয়। কের পূজায় সাধারণত ঃ দুই থেকে তিনজন অচাই (পুরোহিত) লাগে। এই পূজা তিন জায়গায় করা হয়। প্রথমে গ্রামের পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকের কোণে নির্জনস্থানে আচাই তার সাহায্যকারীদের (বারুয়াদের) নিয়ে দুপুর বারটায় এই পূজা করে। এতে গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ঠিক একই সময়ে অথবা এর আগে অন্য একজন অচাই নদীতে গিয়ে গাঙপূজা করে। সেখানে

বলি দেওয়া হয়। তারপর সবাই গ্রামের চৌধুরীর বাড়িতে মিলিত হয়ে খাওয়া দাওয়া করে এবং আনন্দ উপভোগ করে। সাধারণতঃ উপরোক্ত কের-পূজা, গাঙপূজা ও মুদ্রা-পূজার জন্য তিনজন অচাই লাগে। এই পূজা গ্রামের মঙ্গলের জন্য করা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে কেউ করে না।

তৈবুসুয়ামানি (গাঙপূজা বা জলদেবতা) ঃ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এই পূজা করা হয়। এই পূজার সময় বাঁশ দিয়ে ওয়াথপ্ তৈরী করে তার মধ্যে নৈবদ্য দেওয়া হয়। অনেকে পাঁঠা বলি দিয়েও এই পূজা করে। শুধু নৈবদ্য দিয়েও এই পূজা করা যায়। এই পূজা নদীতে অচাইর মাধ্যমে করা হয়। নদীতে বা জল থেকে যাতে কোন বিপদ না হয় তার জন্য এই পূজা দিয়ে জল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা হয়।

মাইকাতাল চামানি (নবান্ন) ঃ- ভাদ্র আশ্বিন মাসে জুম থেকে নতুন ধান তোলার পর নবান্ন খাওয়া হয়। এই উৎসবকে তারা বলে মাইকাতাল চামানি। নদীতে ওয়াথপ্ তৈরী করে এই পূজা দেওয়া হয় এবং বাড়ীতে মাইলুংমা পূজা করা হয়। অচাই এই পূজা করেন। যে বাড়ীতে মাইলুংমা আছে সেখানে এই মাইকাতাল চামানি করা হয়।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পর যে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা হয়, এই লক্ষ্মী পূজাকে কলইরা হজাগরী পূজা বলে। এই পূজার সময় মাইলুংমার পূজাই করা হয়। বৎসরে মাইলুংমার পূজা তিনবার করা হয়- প্রথমবার, বৈশাখ মাসের সেনাপূজার, দ্বিতীয় বার, ভাদ্র আশ্বিনমাসের মাইকাতাল চামানি পূজার সময় এবং তৃতীয়বার , আশ্বিন মাসের হজাগরী পূজার সময়। বর্ত্তমানে অবশ্য কলইদের মাইকাতাল চামানি উৎসব (নবান্ন) দুই সময়ে করা হয়। প্রথমটা ভাদ্র আশ্বিন মাসে অথবা অগ্রাহয়ণ মাসে ধান তোলার পর অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ যারা জুম করে তারা ভাদ্র আশ্বিন মাসে জুম তুলে মাইকাতাল চামানি করে। যারা সমতল ভূমিতে হাল-চাষ করে তারা অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেতের ধান তোলার পর মাইকাতাল চামানি উৎসব করে। হজাগরী পূজা অচাই দ্বারা করানো হয় নতুবা নিজেরাই লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ করে সম্পন্ন করে।

নাক্রী/লাগ্রী পূজা ঃ- এই পূজা চৈত্র মাসে করা হয়। কোন প্রকার কু-দৃষ্টি যাতে না পড়ে সেজন্য তার প্রতিকারস্বরূপ নাক্রী মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। (লাগ্রী = বাঁশের তৈরী দণ্ড, কাইমানি = প্রোথিত করা)। অচাই দ্বারা সন্ধ্যার সময় এই পূজা দেওয়া হয়। এই পূজার দুটি মোরগ ও একটি হাঁস লাগে। এতে বলি অবশ্যই দিতে হয়। এই পূজা কলইদের প্রত্যেকটি শাখার মধ্যেই হয়। এই পূজাকে তারা বিভিন্ন প্রকার আপদ বিপদের রক্ষাকবচস্বরূপ মনে করে।

মামিতা ঃ- কলইদের সকল শাখার মধ্যেই এই পূজা প্রচলিত। এই পূজা বাঁশ দ্বারা একটি প্রতিকৃতি তৈরী করে অচাইর মাধ্যমে করা হয়। অচাইকে অবশ্যই কলই সম্প্রদায়ের হতে হবে। কলইদের বিশ্বাস এই পূজা করলে তাদের ধন-দৌলত ও বংশবৃদ্ধি হবে। এই পূজা ব্যক্তিগতভাবে করা হয় এবং পরিবারের যতজন সদস্য থাকবে তাদের প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক বলি দিতে হয়। হাঁস, মোরগ, পাঁঠা, শূকর, কবুতর ইত্যাদি প্রাণী এই পূজায় বলি দেওয়া যায়। পাঁঠা বলি দিলে তার সঙ্গে একটি কবুতর বলি দিতে হবে- আবার শূকর বলি দিলে তার সঙ্গে মোরগ বা হাঁস বলি দেওয়া যায়। অর্থাৎ একটি চতুষ্পদী প্রাণীর সঙ্গে একটি দ্বিপদী প্রাণী বলি দিতে হবে। কোন পরিবারে যদি পাঁচজন লোক থাকে এবং এই পূজার পাঁঠা বলি দেয়, তবে তাকে পাঁচটি পাঁঠা ও পাঁচটি কবুতর বলি দিতে হবে। এই পূজা দিনের বেলা যে কোন সময়ে করা যায় এবং বাড়ীর সকলকেই পূজার সময় স্নান করে উপস্থিত থাকতে হয়। এই পূজায় অচাইকে দক্ষিণা দেওয়ার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই, তবে অচাইকে দক্ষিণাস্বরূপ টাকা, পাগড়ি, কাপড় ইত্যাদি সাধারণতঃ দেওয়া হয়। এই পূজা উঠানের মধ্যে দেওয়া হয় এবং পূজার সময় অন্য পরিবারের কেউ উপস্থিত থাকতে পারে না। পূজার শেষে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এই মামিতা পূজাই হল সাংগ্রমা পূজা। এই পূজার সময় বাড়ীর কর্ত্তা তার পুরাণো মুদ্রা বের করে এই পূজায় দেয়। এই পূজাকে গণেশের পূজার অনুরূপ বলে ধরা হয়।

চুয়াক্‌খানমানি ঃ- অগ্রহায়ণ মাসে এই চুয়াক্‌খানমানি উৎসব করা হয়। কলই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি মারা গেলে ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের লোকেরা শ্মশানে গিয়ে তার সামাধিতে ফুল দিয়ে সজ্জিত করে। তারপর ঐ সমাধিতে চুয়াক (মদ) ঢেলে দেওয়া হয়। বাড়ী থেকে প্রচুর বিন্নি চাউলের পিঠা, খৈ ইত্যাদি সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা চুয়াক্ পানে অভ্যস্ত তাদের চুয়াক্ দেওয়া হয়। এরপর তারা সম্মিলিতভাবে গান গেয়ে বাড়ীতে ফিরে। মেয়ে-লোকেরাও এতে অংশ গ্রহণ করে। সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী তখন খুব কান্নাকাটি করে। এই উৎসবটা কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর এক বৎসর অতিক্রম করলে পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিনের বেলা করা হয়। এই উৎসব প্রত্যেকেই পালন করে।

শনি পূজা ঃ- কলইদের মধ্যে অনেকে শনি পূজা দিয়ে থাকে। বৎসরে অন্তত একবার এই শনি পূজা দেওয়া হয়। এই পূজায় তারা নৈবদ্য ভোগ দেয় ও শনির পাঁচালী পাঠ করে।

ত্রিনাথের পূজা ঃ- কলইদের মধ্যে ত্রিনাথের পূজার প্রচলনও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। এই পূজায় ত্রিনাথের গল্প বলা হয়।

তাছাড়া দোল পূর্ণিমা, সরস্বতী পূজা, পৌষ সংক্রান্তি, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলিও তারা উৎসাহের সঙ্গে পালন করে। এইসব পূজা পার্বনগুলিতে ফুল, বেলপাতা, দুর্বা, তুলসী পাতা ইত্যাদি উপকরণগুলি লাগে। বিবাহিতা কলই মেয়েরা (সধবাগন) সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাঁখা পরিধান করে। সন্ধ্যার সময় অনেক কলই বাড়ীতে উলুধ্বনি দেওয়া হয়।

বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিকৃতি

কলইরা তাদের চিরাচরিত পূজাগুলির বিভিন্ন দেব-দেবীদের প্রতিকৃতি মাটির পরিবর্ত্তে বাঁশ দিয়ে তৈরী করে। তাদের প্রায় সব ক্রিয়াকর্মেই বাঁশের প্রয়োজন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে বাঁশ দিয়ে দেব-দেবীগণের প্রতিকৃতি তৈরী করার ব্যাপারে তাঁদের শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিকৃতিগুলিতে বাঁশের প্রচুর কারুকার্য্য থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের প্রতিকৃতি তৈরী করতে হয়, কারণ বাঁশের মধ্যে যে ফুল তৈরী করা হয়, তাঁর সংখ্যা বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য বিভিন্ন সংখ্যক নির্দিষ্ট করা আছে। তাছাড়া বাঁশের দণ্ডগুলিও বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য বিভিন্ন প্রকার নির্দিষ্ট পদ্ধতি সাজানো হয়। এ ব্যাপারে আচাই হলেন প্রধান কর্মকর্ত্তা ব্যক্তি। তাঁর নির্দেশেই এই সব প্রস্তুত করা হয়। কলইরা তাদের পূজার জন্য বাঁশ দিয়ে ওয়াথপ, দিপ, লাংখাং /লাংখাই/চুফং, থারুমা, নাক্রী/ লাগ্রী, খুলৌং, চারতাংমানি, যাকবার, থাপ্না, মৈলাওবার, কৈন্দুক, ওয়াখার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জিনিষ তৈরী করে। নিম্নে তাদের পূজা পার্বণের কয়েকটি উপকরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ঃ-

১। **ওয়াথপ ঃ-** বাঁশ দিয়ে পূজার বেদী তৈরী করা হয় তাহাই ওয়াথপ। ওয়াথপ শব্দটা ওয়া (বাঁশ) এবং বথপ (পাখীর বাসা) শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভুত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ বাঁশ দিয়ে যে দেবতার আসন (বেদী) তৈরী করা হয় বলেই এর নাম ওথাথপ। এই ওয়াথপ হল কলইদের পূজাপার্বণের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং তাদের অধিকাংশ পূজায়ই ওয়াথপ এর প্রয়োজন হয়। লাম্প্রা পূজা, থুনাইরাও বনিরাও পূজা, বলং সুওগমানি, বুড়াছা প্রভৃতি বিভিন্ন পূজায় ওয়াথপ লাগে।

ছয়টি সমান দৈর্ঘ্যের কাঁচা বাঁশ দিয়ে ওয়াথপ তৈরী করা হয়। এতে দুটি বাঁশ একত্র করে নির্দিষ্ট পরিমান দূরত্বে ঐ বাঁশের জোড়াগুলি পুঁতে দেওয়া হয় এবং তার উপর দিকে দুটি বাঁশ একত্র করে বেধে দেওয়া হয়। এই ছয়টি বাঁশের টুকরারই সাধারণতঃ দেড় হাত পরিমাণ দৈর্ঘ্য থাকে। বাঁশের দণ্ডগুলির উপরের ছিদ্রগুঁলিতে বাঁশের পাতা দেওয়া হয়। এবং ঐ দণ্ডগুলিতে যথেষ্ট কারুকার্য্য করা হয়।

২। লাংখাং বা চুফং ঃ এই লাংখাং বা চুফং প্রত্যেক পূজায়ই ব্যবহার করা হয়। এরদ্বারা দেবতাগণের উদ্দেশ্যে জল বা চুয়াক (মদ) নিবেদন করা হয়। যে বাঁশের পাত্রটি দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করা হয় তাকে লাংখাং বলে এবং যে পাত্র দিয়ে চুয়াক নিবেদন করা হয় তাকে চুফং বলে।

৩। দীপ ঃ- একটি নির্দিষ্ট মাপের বাঁশের টুকরা নিয়ে একে মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বিভাবে ফাড়া হয় এবং ঐ বাঁশের পাতাটির দুইদিক টাক্কল (দা) দিয়ে সুন্দরভাবে ফুল তোলা হয়। দীপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার ফুল তোলা হয়।

দীপ সাধারণত ঃ দুই প্রকার যথা-

ক) 'শূকালজুকমতাই' পূজা ছাড়া অন্যসব পূজায় যে দীপ লাগে তার মাত্রা সংখ্যা পাঁচটি (মাত্রা মানে ফুল)।

খ) রুইরাও বা 'শূকালজুকমতাহ' পূজার দীপের মাত্রা সংখ্যা নয়টি।

৪) খং ঃ -একটি বাঁশের বেতের উপর দুই দিকে ফুল তুলে ধনুকের মত বাঁকা করে এটা তৈরী করা হয়। এর দুই দিক মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। সাংগ্রং পূজা, গাঙ্গ পূজা, কের পূজা, বিবাহ প্রভৃতিতে খং লাগে।

৫। থারুমা ঃ- একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘের বাঁশকে তার নীচের অর্দ্ধেক অংশ কেটে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এর উপরে ছিদ্রগুলিতে বাঁশের পাতা দেওয়া হয়।

৬। খুলৌং ঃ- এটা দেখতে অনেকটা বাঁশের বেতের টুকরীর মত। এটা বুড়াছা পূজায় লাগে।

৭। নাগ্রী (লাক্রী) ঃ- গ্রামের মঙ্গলরে জন্য চৈত্রমাসে এই পূজা দেওয়া হয়। নাক্রী দুইভাবে তৈরী করে পূজা দেওয়া যায়। সাধারণত ঃ কারুকার্য্য করা একটি মুলি বাঁশের দণ্ডকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় এবং তার উপরের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তুলা বেধে দেওয়া হয়। এতে সুতার রং এর ব্যবহারেরও বিশেষ নিয়ম আছে। বুড়াছা পূজায় সাদা ও কাল এই দুই রং-এর সুতাই সময় অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

অপর দিকে ডেক্স্রাম নামক এক প্রকার গাছের দুই ডাল বিশিষ্ট একটি শাখায় তুলার (জুমের তুলা) দুইটি পুটুলী বেধে দিয়েও নাক্রী তৈরী করা যায়। এতেও সাদা অথবা কাল এই দুই রং এর সুতাই ব্যবহার করা যায়।

৮। চারতাংমানি ঃ-তৈখুলুমানিকে (জলদেবতাকে) সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে গাঙ পূজা করা হয় তার জন্যই চারতাংমানি তৈরী করা হয়। এটা প্রস্তুত করতে চারটি বাঁশের টুকরাকে

মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার উপর ছয়টি বাঁশের পাতলা বেত সাজিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের খুটিগুলির মধ্যভাগে বাঁশের বেত দিয়ে একটি চাঙনি (মাচা) তৈরী করা হয়।

৯। মাইলুংমা ঃ- এটা প্রত্যেক কলই বাড়ীতেই লক্ষ্মীর ঘট হিসাবে রাখা হয়। একটি মাটির ঘটের একদিকে সিঁদূর দিয়ে একটি (স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত ঘটটি) রাখা হয়। ঘটের মধ্যে চাউল রাখা হয় এবং প্রতিদিন একে ধূপবাতি দেখানো হয় ও ফুল দেওয়া হয়। স্বস্তিক চিহ্নটাকে কলইরা মাইলুংমা কাইয়ামাইয়া (কাইয়া = দেহ, মাইয়া = মহামায়া) বলে। কোন যৌথ পরিবার পৃথক হলে ঐ পৃথক পৃথক অংশীদারগণ পৃথকভাবে মাইলুংমার আসন বসায়।

১০। থাপ্লা ঃ- তৈখুলুমানি পূজার সময় যে চারতাংমানির লাগে তার দুইপাশ বাঁশের উপর চটি করে দুইটি বাঁশের টুকরা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়।

কলই সমাজে অচাইর ভূমিকা ঃ-

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠী সমূহের ন্যায় কলই সমাজেও অচাই (পুরোহিত) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন। তাদের অচাইকে অবশ্যই কলই সম্প্রদায়ের লোক হতে হবে। অচাই কলইগণকে একদিকে যেমন ধর্ম সংক্রান্ত উপদেশ দেন ও তাদের বিভিন্ন প্রকার চিরাচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, আবার অন্যদিকে তিনি বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসক হিসেবেও কাজ করেন। কলই সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। এটা ঠিক যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এই অচাইগণই কলই সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতি গুলিকে আকড়ে ধরে রয়েছেন এবং কলই সমাজের ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে অচাইরা অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং পুরাতন রীতিনীতি,বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি থেকে বিচ্যুৎ হওয়ার বিরোধী। বর্ত্তমানে কলই যুব সমাজের কিছু অংশের মধ্যে তাদের প্রাচীন বিভিন্ন রীতিনীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন কমছে এবং তারা কিছুটা পরিবর্ত্তনে বিশ্বাসী। এর ফলে আচাইগণ তাদের সমাজের কিছু অংশের নিকটপূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা পাচ্ছেন না। এখন অচাইগণ যদি তাদের প্রাচীনপন্থী মতবাদ থেকে কিছুটা নমনীয় হন এবং সমাজের মূল সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এবং তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে কলই সমাজকে নেতৃত্ব দেন তাহলেই এই সমাজ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রাম প্রশাসন ও রাজনীতি

কলই সমাজের শৃঙ্খলা ও তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য জমাতিয়া, মরছুম প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতিদের মত তাদেরও একটি নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন সমগ্র কলই সমাজকে পরিচালনা করার ব্যবস্থা অন্যদিকে তেমন প্রতিটি কলই গ্রামকে যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সে জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব কতগুলি সমস্যা থাকতে পারে যেগুলি সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি কলই গ্রামে একজন করে চৌধুরী ও দুইজন করে খান্দল (দূত) এর বন্দোবস্ত আছে। চৌধুরী গ্রামের মঙ্গলের জন্য সর্বোতভাবে সচেষ্ট থাকেন। তবে কোন গ্রামে যদি কলই হদার (সমাজের) কোন একজন প্রতিনিধি থাকেন তবে সেই গ্রামে চৌধুরীর প্রয়োজন হয় না।

কলই হদার (সমাজের) শাসনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্য্যন্ত ৭টি (সাতটি) পর্য্যায়ে বিভক্ত। কলই হদার সর্বোচ্চস্তরের পদাধিকারী ব্যক্তিকে বলা হয় 'রায়'। তিনিই সমাজের সর্ব প্রধান কর্তাব্যক্তি। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই রায় হতে পারবে না, কারণ কলই রায় হতে হলে তাকে তাদের শাসন কাঠামোর প্রথমস্তর থেকে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ৬টি পর্য্যায় অতিক্রম করে 'রায়' উপাধি অর্জন করতে হবে।

তাছাড়া এই শাসন ব্যবস্থায় কলইদের ভিতরগত সাতটি শাখাই যাতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার প্রথম দিকে কলই রায়গণ সারা জীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন। কিন্তু তাতে দেখা গেল যে যারা ঐ শাসনব্যবস্থার নীচের স্তরের দায়িত্বে আছেন, তারা রায় পদবী লাভ করার সময়ই পান না। এছাড়া কোন একটি শাখা থেকে একবার রায় নির্বাচিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য ছয়টি (৬টি) শাখা থেকে রায় হওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং এসব অসুবিধা দূর করার জন্য তারা বর্ত্তমানে প্রতিটি পদের স্থায়িত্ব কাল তিন বৎসর করে স্থির করেছেন। তাদের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যুগপোযোগী হয়েছে। প্রতি তিন বৎসর পর পর অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা দিন তাদের শাসন ব্যবস্থার কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নতুন রায় নির্ব্বাচিত হন।

কলই রায় যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও তাদের মধ্যে আছে। এমন কি অপরাধের জন্য রায়কে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতাও সমাজের জনগণের আছে। তাদের সমাজে একটি অলিখিত নিয়ম প্রচলিত আছে যার জন্য প্রতি তিন বৎসরের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় নিজ নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং নীচের স্তরের পদাধিকারী ব্যক্তিগণ প্রমোশন পেয়ে উপরের স্তরে উন্নীত হবেন এবং রায় পদত্যাগ করার সময় তার কাছে গচ্ছিত সমস্ত সূলেনামা ও মহারাজ প্রদত্ত বিভিন্ন জিনিষ পরবর্ত্তী রায়কে বুঝিয়ে দেবেন। এতে অন্যথা করলে সমাজের নিয়ম অনুযায়ী আইনত ১৫.০০ (পনের টাকা) অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় ও প্রমাণের জন্য প্রত্যেক পদাধিকারী ব্যক্তির নিকট একটি করে ষ্টাম্পসীল থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য যে কলইদের এই নিজস্ব শাসন-পদ্ধতি (Self governing Institution) তাদের সমাজে স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজও চলে আসছে। তাদের সমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা, তাদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ঠ্য বজায় রাখার ব্যাপারে এই শাসন ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমানেও কলই রায়ের মর্য্যাদা তাদের মধ্যে সর্ব্বজন স্বীকৃত। এই শাসন ব্যবস্থার সাহায্যে এখনও তাদের বিভিন্ন সমস্যা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি তারা নিজেরাই মীমাংসা করে। এ ব্যাপারে তারা অন্য কোন সম্প্রদায় বা সমাজের হস্তক্ষেপের বিরোধী। এই সংগঠনটি রাজনীতিমুক্ত থাকার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কথা ভুলে সকলে একত্রে তাদের সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। কলইদের শাসন ব্যবস্থার এই সংগঠনটি থাকার ফলে

তাদের সমাজের লোকজনকে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী আদালতের আশ্রয় খুব কমই নিতে হয়।

যদিও কলইদের এই সামাজিক শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে কিন্তু এব্যাপারে সঠিক তথ্যের অভাবে কোন সময় থেকে বা কোন মহারাজার আমল থেকে তাদের এই শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে এব্যাপারে অনুসন্ধানের পর জানা গিয়েছে যে, তাদের এই শাসন ব্যবস্থার প্রথম স্তরে শাসন বিভাগের প্রধানগণ (রায়) সারাজীবনের জন্য শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন এবং পরবর্ত্তীকালে তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না, যে কলইদের এই শাসন ব্যবস্থা তাদের নিজেদের সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের দ্বারাই গড়ে উঠেছিল এবং এই অবস্থায় কোনরূপ বাইরের প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে তৎকালীন মহারাজাদের প্রভাবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী উপজাতিগোষ্ঠীর যে প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল তারই ফলে কলই শাসন ব্যবস্থার বর্ত্তমান বিবর্তিত রূপটি কলই সমাজের অনেক বয়স্ক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও অনেক অনুসন্ধানের পর তাদের এ পর্য্যন্ত যে ঊনপঞ্চাশ (৪৯) জন রায়ের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

রায়ের নাম	হদা	বাড়ী
১। তাওলা রায়	ওয়াকবুর	বাতিবন
২। ওয়ানজুই রায়	আবেল	বাতিবন
৩। বনবীর	রুজুগুই	বাতিবন
৪। চরণ সিং	আবেল	তৈদু
৫। রামচন্দ্র কলই	ওয়াকবুর	টাকারজলা
৬। ফুদুরাম	আবেল	ছাইমানরুয়া (উদয়পুর)
৭। জলেরাম	রুজুগুই	সিংনালা (মহারাণী)
৮। ছাইছা রায়	বুকাং	খুম্পুইলং
৯। দশরথ কলই	রুজুগুই	বাহওরবাড়ী (উদয়পুর)
১০। চান্দ কলই	রুজুগুই	টাকারজলা
১১। খুচিরাম কলই	বুকাং	এরামবাড়ী (উদয়পুর)
১২। কমলকান্ত	কুছু	ছাইমানরুয়া (উদয়পুর)

১৩। দলচন্দ্র কলই	চড়াই	ছাইমানরুয়া (উদয়পুর)
১৪। পূর্ণচন্দ্র কলই	আবেল	তৈদু
১৫। আচংরায় কলই	ওয়াক্প্লম	তৈদু
১৬। গগণচন্দ্র কলই	রুজুগুই	মেলছিমুখা (অম্পি)
১৭। মহামুনি কলই	বুকাং	এরামবাড়ী (উদয়পুর)
১৮। বৈকুণ্ঠ কলই	চড়াই	তৈদু
১৯। সত্যরাম কলই	ওয়াপ্লম	এরামবাড়ী (উদয়পুর)
২০। সুমন্ত কলই	কুছু	এরামবাড়ী
২১। বাস্যা কলই	রুজুগুই	রূপাছড়া (খোয়াই, তেলিয়ামুড়া)
২২। লালবাহাদুর কলই	কুছু	তৈন্তেখড় (উদয়পুর মহকুমার ছোট গঙ্গরাইর নিকট)
২৩। সঞ্জয়মুনি কলই	বুকাং	বৈশ্যমুনি পাড়া
২৪। মঙ্গলচন্দ্র কলই	আবেল	হলুয়া
২৫। ইন্দ্রমুনি কলই	চড়াই	ছাইমানরুয়া
২৬। তৈদু রায়	ওয়াক্বুর	পল্কু
২৭। রাধাকান্ত কলই	বুকাং	ব্রহ্মছড়া
২৮। রবিচন্দ্র	রুজুগুই	তৈকৈ (তেলিয়ামুড়া)
২৯। ধনমুনি কলই	কুছু	ব্রহ্মছড়া (তেলিয়ামুড়া)
৩০। হরিচরণ কলই	ওয়াপ্লম	ব্রহ্মছড়া
৩১। মিলিধন কলই	ওয়াক্বুর	ব্রহ্মছড়া
৩২। পদ্মমুনি কলই	চড়াই	খোয়াই (কমপুর)
৩৩। মিত্র কলই বুকাং		বৈশ্যমুনি পাড়া
৩৪। দরখাস্ত কলই	রুজুগুই	হলুয়া
৩৫। বলরাম কলই	আবেল	হলুয়া
৩৬। কামিনী কলই	কুছু	পল্কু
৩৭। মালিকুমার কলই	—	ওয়াকবুর - সর্দূকর্করি।
৩৮। তরণি কলই	—	চরাই - ধনলেখা।
৩৯। বিন্দু কলই	—	ওয়াপ্লম - দারকাই।
৪০। দয়াল কলই	—	রুজগুই - বৈশ্বমনি।

৪১। মাদায় কলই	—	বুকাঙ - বৈশ্বমনি।
৪২। নরেন্দ্র কলই	—	ওয়াকবুর - পল্কুকামি।
৪৩। রমনি কলই	—	চরাই - জামিরছড়া।
৪৪। মঙ্গলচন্দ্র কলই	—	ওয়াপ্লম - বাহাওরকামি।
৪৫। প্রবীর কলই	—	কুছু - কালাচানপাড়া।
৪৬। কর্ণদাতা কলই	—	আবেল - হুলুয়া।
৪৭। নিকুঞ্জ কলই	—	রুজগুই - তৈকৈ।
৪৮। শচীন্দ্র কলই	—	ওয়াকবুর - দারকাই কলই পাড়া।
৪৯। উমাকান্ত কলই	—	বুকাং - বৈশ্বমনিপাড়া।

বর্তমান কলই সমাজ পরিচালনা কমিটির পরিচয়

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলই দফার বাইশ (২২) নং রায় শ্রীলালবাহাদুর কলইর নাম শ্রীব্রজেন্দ্র দত্তের 'উদয়পুর বিবরণ' নামক গ্রন্থে পার্বত্য প্রজাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নামের তালিকার মধ্যে উল্লেখিত আছে 'শ্রীলালবাহাদুর রায় ঃ কলই দফার বর্ত্তমান রায়। নির্বাচন প্রথানুসারে নিযুক্ত। তিলতুইখড় নামক স্থানে বাস করে। ইহাদের কাঞ্চনের নাম শ্রীবাদারায়" (শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, উদয়পুর বিবরণ ১৩৪০ ত্রিং / ১৯৩০ খ্রীঃ পৃষ্ঠা -৭৩)

বর্তমান কলই সমাজ পরিচালনা কমিটির পরিচয়		
পদের নাম	পদাধিকারী ব্যক্তির নাম	গ্রামের নাম
রায়	উমাকান্ত কলই	বৈশ্বমনিপাড়া।
গালিম	বৈষ্ণব কলই	জামিরছড়াপাড়া।
কামছিকাও	মঙ্গলপদ কলই	বাহাত্তরপাড়া।
গাবুর	মহেশ কলই	তৌছেন খাটি রামপাড়া।
জাকসুঙ	সত্যকলই	তৈদুখাম্বারপাড়া।
খুকসুম	অনুপ কলই	যন্ত্রনাপাড়া।
সেঙ্গা	দারজিলিং কলই	অম্পি।

এই নির্বচিত শাসকগণ ৩ বৎসরের জন্য ক্ষমতায় আসেন।

কলই শাসন ব্যবস্থার ৭টি পদাধিকারী ব্যক্তির ক্রম পর্যায় ঃ-

১। সেঙ্গা (সর্বনিম্ন পদ)

২। খুকসুং

৩। যাকসুং

৪। গাবুর

৫। কাঞ্চন

৬। গালিম

৭। রায় (সর্বপ্রধান ব্যক্তি)

কলই শাসন ব্যবস্থায় পদাধিকারী ব্যক্তিগণের কার্যাবলী ঃ

(১) সেঙ্গা ঃ কলই সমাজ পরিচালন সমিতির সাতটি স্তরের মধ্যে এটা হল সর্বনিম্নপদ। মহারাজ প্রদত্ত যে চণ্ডি দিয়ে সমাজপতিরা সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ্যপান করে সেই চণ্ডির বাহক হলেন সেঙ্গা। কলই সমাজের যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সমাজপতি রায়ের নির্দেশে তাকে চণ্ডি ও চান্দুওয়া নিয়ে যেতে হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান তাকেই পরিচালনা করতে হয়। সমাজের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তিনিই দেখাশুনা করেন।

(২) খুকসুঙ ঃ সামাজিক অনুষ্ঠানে সেঙ্গা যে সব কাজকর্ম করে তাকেও সেইসব কাজকর্ম করতে হয়। তিনি সেঙ্গাকে সর্বপ্রকার সামাজিক কাজকর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে কলই সমাজপতিদের সুবিধা-অসুবিধা দেখাশুনা করা এবং অনুষ্ঠানে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তার উপর। তাছাড়া সমাজের শিক্ষা বিভাগ তিনি দেখাশুনা করেন।

(৩) জাকসুম ঃ তিনি সমাজে যে কোন ধরনের বিচার বা সমস্যা সমাধান করতে পারেন। তিনি সমাজের পরিবার ও জনসংখ্যা বিভাগ দেখাশুনা করেন।

(৪) গাবুর ঃ তিনি সমাজের যে কোন ধরনের বিচার বা সমস্যা সমাধান করতে পারেন। তাকে নিজের পাড়ার চকদিরির দায়িত্বেও থাকতে হয়। তিনি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মহারাজ প্রদত্ত একজোড়া রূপার বালা ব্যবহার করেন। তিনি সমাজের বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি দেখাশুনা করেন।

(৫) কামছিকাউ ঃ তিনি সমাজের সবধরনের বিচার বা সমস্যা সমাধান করতে পারেন। নিজের কামির চকদিরির দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়। সমাজের যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি মহারাজা প্রদত্ত একজোড়া রূপার বালা, একজোড়া রূপার নাবাক, স্বর্নের লকেট ও রাইদাঙ (বেত) ব্যবহার করেন। তার বাড়িতে রক্ষিত থাকে কলই সমাজের প্রতীক মায়ুঙসা - করাইসা, ২টি বড় বড় দা, ৩টি পাথর, ৫টি ত্রিশূল এবং ৬টি কল।

গাইলিম ঃ তিনি সমাজের যে কোন ধরণের বিচার বা সমস্যা সমাধান করতে পারেন। নিজের কামির চক্‌দিরির দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়। তিনি সমাজের যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মহারাজার প্রদত্ত একজোড়া রূপার বালা, একজোড়া রূপার নাবাক, রূপার লকেট ও রাইদাঙ (বেত) ব্যবহার করেন। তিনি সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলা বিভাগ (বিচার সংক্রান্ত) দেখেন।

রায় ঃ রায় সমাজের যে কোন ধরনের বিচার বা সমস্যা সমাধান করতে পারেন। রায়ের বিচারালয় সমাজের সর্বোচ্চ বিচারালয়। নিজের কামির চক্‌দিরির দায়িত্বও তাকে নিতে হয়। তিনি মহারাজা প্রদত্ত একজোড়া রূপার বালা, একজোড়া নাবাক, স্বর্ণ এবং রূপার লকেট ও রাইদাঙ (বেত) যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেন।

তিনি সমাজের যে কোন বিভাগই দেখাশুনা করেন। সমাজ পরিচালন সভার যে কোন মিটিং সাধারণত তার বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ রায়ের বাড়ীই কলই সমাজের কেন্দ্রিয় অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাদের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান রায়- বালমা পাণ্ডা রায়ের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি হিসাবে পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কাউকে মাথানত করে পা ধরে প্রণাম করবেন না অবশ্য হাত জোড় করে বা মৌখিক নমস্কার জানাতে পারেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য মহারাজা প্রদত্ত বিভিন্ন জিনিষ যেমন ৩ (তিন)টি তলোয়ার, ১ (এক) টি বড় দা, ৬টি সালবান্ডা - তালবাণ্ডা ইত্যাদি রায়ের বাড়িতেই যত্ন সহকারে রক্ষিত থাকে। রায় পদে থাকাকালীন সময় যদি রায়ের স্ত্রীর মৃত্যুর পর রায় পদ হারায় তবে সারাজীবন সে রায়বুড়া হিসাবে মর্য্যাদা পাবে এবং সামাজিক সুবিধা ভোগ করবেন। আবার রায় পদে থাকাকালীন অবস্থায় কোন রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী সারাজীবন রায়জৗক হিসাবে পরিচিত ও সামাজিক সুবিধা ভোগ করেন।

উপদেষ্টা মণ্ডলী

কাইথার ঃ কাইথারদের তিন বৎসর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার শেষ বৎসরে 'রায়-বালমা পাণ্ডার পরদিন যখন কার্যভার হস্তান্তর করা হয় তখন সমাজ পরিচালন সভার সদস্যরা সমস্ত হদা প্রধান এবং কামি চকদিরিদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে ৪(চার) জন করে কাইথার পরবর্তী তিন বছরের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কাইথার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে কোন হদা বা পাঞ্জী বিবেচনা করা হয় না এবং নির্বাচনের পর কোন ভোজ সভাও করতে হয় না।

বিরিসিং ঃ কাইথারের ৩(তিন) বছর কার্যকাল মেয়াদ পূর্ণ হবার পর তারা বিরিসিং পদে উন্নীত হন। তাদের নির্বাচিত হতে হয় না এবং নির্দিষ্ট কার্যকালও থাকে না। সমাজ পরিচালন সভার সদস্যরা সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনায় ব্যর্থ হলে মুইলা সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে বিরিসিংদের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা করেন।

মুদি ঃ প্রত্যেক বছর 'রায়-বালমা পাণ্ডার' ৩০-৪০ দিন পূর্বে সমাজ পরিচালন সভার সদস্যরা সমস্ত হদা প্রধান এবং কামি চকদিরিদের সঙ্গে আলোচনা করে বিরিসিংদের মধ্য থেকে যে কোন দুইজনকে প্রথম পছন্দ ও দ্বিতীয় পছন্দের ব্যক্তি হিসাবে মুদি পদের জন্য নির্বাচন করেন। প্রথম পছন্দের ব্যক্তি রাজী না হলে দ্বিতীয় পছন্দের ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সমাজের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সহকারী প্রধান। মুইলা যে কাজ দেখাশুনা করেন, তিনিও তা দেখাশুনা করেন।

মুইলা ঃ মুদি সামাজিক ভাবে নির্বাচিত হবার পর পূর্ববর্তী মুইলা অবসর গ্রহণ করেন এবং বর্তমান মুদি পদন্নোতি পেয়ে মুইলা পদে উন্নীত হন। তখন পরবর্তী রায়-বালমা পাণ্ডার দশদিন পূর্বে সামাজিক চাখাঁই-চারথাং ভোজ সভা করতে হয়। তখন তিনি একবছরের জন্য মুইলা পদ গ্রহণ করেন।

তিনি সমাজের উপদেষ্টা মণ্ডলীর প্রধান। যখন সমাজ পরিচালন সভার সদস্যরা সক্রিয়ভাবে সমাজ পরিচালনা করতে না পারে তখন তিনি নিজ হাতে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজ পরিচালন সভা পুনর্গঠিত না হয়। তাছাড়া সমাজ পরিচালন সভা কোন সমস্যা সমাধান করতে না পারলে তাদের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ নিতে পারে।

চক্‌দিরি ঃ সামাজিক বিচারের সর্বনিম্ন বিচারালয় হলো চকদিরির বিচারালয়। শুধুমাত্র তার নিজস্ব গ্রামের যে কোন রকমের বিচার তিনি করতে পারেন। উচ্চতর সামাজিক বিচারালয়ে কেউ বিচার প্রার্থী হলে চকদিরির অনুমোদন প্রয়োজন হয়। চকদিরিকে অবশ্যই কলই সমাজের লোক হতে হবে। কলই কামির লোকজন তাদের কামি থেকে যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে চকদিরি নির্বাচন করতে পারেন। তাদের কার্যকাল তিন বৎসর এবং মেয়াদ শেষ হলে পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। সামাজিক পরিচালন সভার সদস্যরা চকদিরির মাধ্যমে সমাজের তথ্য সংগ্রহ করেন। কামির সমস্ত সদস্যাদির আলোচনা তার বাড়িতেই তার সভাপতিত্বে হয়। তাকে বছরে কম করে একবার বার্ষিক 'রায়-বালমা পাণ্ডার সময় সমাজ পরিচালন সভার নিকট কামির বার্ষিক রিপোর্ট জমা দিতে হয়। সমাজ পরিচালনা সভার কোন সদস্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোন কামিতে গেলে তাকে প্রথমে কামির চক্‌দিরির বাড়িতেই প্রথম উঠতে হয় এবং চকদিরির

কাছে থেকে সংবাদ নিয়ে ঐ অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করেন। কামির বার্ষিক কের পূজা তার বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়।

খাঙদল ঃ কামি চকদিরির নির্দেশে কামির খঙদলরা সবরকম কাজকর্ম করে। খাঙদলের মাধ্যমে চকদিরি কামির সব রকম খবর সংগ্রহ করে। রায়, গাইলিম ও কামছিকাউ এর খাঙদলরা নিজ নিজ প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে কাজকর্ম করে। পরিচালন সভার প্রতিনিধিরা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার সময় যে কোন খাঙদলকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

সচিব ঃ সমাজ পরিচালন সভার সদস্যদের নিজ নিজ দপ্তরের তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, তথ্য সংগ্রহ এবং সর্বপ্রচার লেখালেখির কাজ তাদেরকেই করতে হয়।

অচায় ঃ সমাজের অচায় দিয়ে সমাজের বাৎসরিক রায়-বালমা পাণ্ডার সমস্ত রকমের পূজা করতে হয়। প্রত্যেক বৎসর অচায় বাঙেমানির মাধ্যমে অচায় নিযুক্ত করতে হয়। তাছাড়া সমাজের সব সামাজিক অনুষ্ঠান, পারিবারিক অনুষ্ঠান অচায় দিয়ে করতে হয়। যেমন— কেবেঙবুমানি, আবুরসুমানি, বিবাহ অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, সমাজের মায়োঙসা - করাইসা পূজা, গ্রামেগ্রামে কের পূজা, গড়িয়া পূজা, মাইনুকমা পূজা, মাই-কীতালচামানি, সাঙগ্রঙ, তাঁই খুলুমা ইত্যাদি।

রায়বুড়া ঃ রায় বুড়াদেরকে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সন্মানের সহিত আসন প্রদান করে সন্মানিত করা হয়। যদিও রায় বুড়াদের সামাজিক ভাবে কোন বিশেষ দায়িত্ব থাকে না কিন্তু সমাজ পরিচালনা সভার সদস্যরা তাদের নিকট প্রয়োজনে পরামর্শ চাইতে পারে।

পরিচালন সভার সদস্যপদের যোগ্যতা

যোগ্যতা ঃ

(১) শুধুমাত্র বিবাহিত ব্যক্তিরাই পরিচালন সভার সদস্য হতে পারে।

(২) পুরুষ ব্যক্তিরাই প্রতিনিধি হতে পারে।

(৩) সামাজিকভাবে বিবাহিত ও স্ত্রী বর্তমান ব্যক্তিরাই পরিচালন সভার সদস্য হতে পারে।

(৪) পরিচালন সভার সদস্যদের নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজনীয়।

(৫) সেঙ্গার নুন্যতম বয়স ২৫ বছর এবং উর্ধতম বয়স ৩৫ বছর হবে।

(৬) সামাজিক ও সরকারী আইনে অপরাধী বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সদস্য হতে

পারে না। সদস্য অবস্থায় কেহ যদি দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে।

(৭) পরিচালন সভার সদস্য থাকা অবস্থায় কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিচালন সভার সিদ্ধান্ত ব্যতীত অংশ গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলের কার্যকরী কমিটির সদস্য হতে পারবেনা।

(৮) পরিচালন সভার সদস্য থাকা অবস্থায় কোন রকম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও সরকারী প্রতিনিধি মনোনীত হতে পারবেনা।

(৯) সেঙ্গা নিযুক্তি অবশ্যই হদা বা পাঞ্জী হতে নির্বাচিত হতে হবে।

(১০) মুদি, মুইলা, কাইথার, চকদিরি ও খাঙদল নিযুক্তির ব্যাপারে কোন হদা বা পাঞ্জী নির্বাচন লাগবে না।

(১১) মুদি ও মুইলার নূন্যতম বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বছর, কাইথার ও চকদিরির নূন্যতম বয়স ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর এবং খাঙদলের নূন্যতম বয়স ২১ (একুশ) বছর।

সভার সদস্য পদ থেকে বহিস্কার হওয়ার কারণ ঃ

(১) সভার সদস্য থাকা অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু।

(২) সদস্য অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ।

(৩) সদস্য অবস্থায় সামাজিকভাবে বা সরকারীভাবে দোষী সাব্যস্ত সাজাপ্রাপ্তি।

(৪) কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হওয়া।

(৫) কোন রকম নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

(৬) পরিচালন সভার মিটিং-এ একনাগারে তিনবার অনুপস্থিত থাকা এবং এর জন্য উপযুক্ত কারণ না দর্শানো।

(৭) বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে একনাগারে তৃতীয়বার সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে জরিমানা প্রদান।

অঞ্চল বিভাগ ঃ সামাজিক শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কলই অধ্যুষিত কামিগুলিকে তারা অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন করেছে যেমন —

(১) খোয়াই (তেলিয়ামুড়া) (২) বড়মুড়াতলা (৩) তৈদু (৪) অম্পি (৫) ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা।

অঞ্চল ভিত্তিক কামি সমূহ ঃ

(১) খোয়াই (তেলিয়ামুড়া) ঃ ব্রহ্মছড়া, ব্রহ্মবিল, খাসিয়ামঙ্গল, নবীন কলই (সর্দূকর্করি), রূপাছড়া, তৈক্রানমা, তৈকৈ বলাই দাস, তৈকৈ বুধুরায়, তৈকৈ রুপিনি, তৈকৈ সাক্ম ইত্যাদি।

(২) বড়মুড়াতলা ঃ বড়মুড়া, তৈবাকলাই, কিল্লা, ওয়াইঘাটি, থেলাকুণ্ড, জেলুওয়া, বাহাত্তর, চাম্পাছরমা (অর্জুন পাড়া), দ্বারকাই, জয়মনিসাধু, কালিকান্ত, ব্লকটিলা, তৈছা রাঙচাক, কন্দ্রা, বৈরাগী, আগরতলা আমতলি, আগরতলা ইত্যাদি।

(৩) তৈদু ঃ তৈদুখাম্বার, উত্তর তৈদু (তৈদু রামবাবু), দক্ষিণ তৈদু (তৈদু কামিচাম), তৈদু খাকচাঙ, লক্ষ্মীধন, পঙ্কু, জাকছুয়া।

(৪) অম্পি ঃ তৈছেন, তৈছেন খাতিরাম, ছেরথুম, মন্দু তৈছা, মন্দার পাড়া, সিনাই পাড়া, সঙগাঙ খাম্বার (বৈশ্বমনি খাম্বার), কালাচানপাড়া, সঙগাঙ (বৈশ্বমনি), অম্পি, হলুয়া, হরিপুর, যন্ত্রনা, ধনলেখা ইত্যাদি।

(৫) ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা ঃ চামুলছড়া, পাতাবিড়ি, ঘন্টাছড়া, কাছেঙ-তৈছা, আমবাসা, মনু, জামিরছড়া, ধুমাছড়া, খেদাছড়া ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবর্তন ও পর্যবেক্ষণ

কলইদের প্রাচীন রীতিনীতি, বিশ্বাস, জীবনধারা প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে যে আলোচনা করা হয়েছে যে, তা সমতলবাসী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। যেহেতু সংস্কৃতি গতিশীল, অতত্রব কলইদের সাংস্কৃতিক জীবনও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কলইরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মৌলিক উপাদানগুলিকে এখনও বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। যদিও এই মৌলিক উপাদানগুলিও আধুনিকতার প্রভাবে ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে। কলইদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তন সাধারণত ঃ দুটি ধারায় হয়েছে। প্রথম ধারায় কলইদের ত্রিপুরী, মরশুম, কুকি, রিয়াং, জমাতিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে তাঁদের নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়েছে। একে আমরা Inter tribal acculturation বলতে পারি।

দ্বিতীয় ধারায় কলইদের পাশাপাশি অ-উপজাতিদের (বাঙ্গালীদের) দীর্ঘদিন বসবাসের দরুণ সমতলবাসী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রভাবও তদের জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। একে আমরা বলতে পারি tribal-non-tribal acculturation.

উপরোক্ত দুটি ধারা ছাড়া আধুনিক শিক্ষা ও সহযোগ, শহরের সংস্পর্শ, সিনেমা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রভাব, সরকারী উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির সাহায্যে কলইদের সার্বিক জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনে সাহায্য করেছে। যে সমস্ত বিষয়ের উপর তাদের এই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

অর্থনৈতিক

কৃষিকার্য্য ঃ

কলইদের অর্থনীতি প্রধানত ঃ কৃষিভিত্তিক এবং কৃষিকার্য্যের জন্য জুম ও সমতল ভূমিতে গরু দিয়ে হাল চাষ করা। এই দুই পদ্ধতিই তাদের মধ্যে প্রচলিত। কৃষিকার্য্যের জন্য প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করলেও বর্ত্তমানে কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সার, কীটনাশক ঔষধ, অধিক ফলনশীল বীজ ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে এখন তারা বেশ সচেতন। এমনকি ধান ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য বর্তমানে তাদের মধ্যে দু'একজনের নিজস্ব 'পাম্পসেট'ও আছে। সুতরাং কৃষিকার্য্যের ব্যাপারে তারা নিজেদেরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্থ করে তুলছে।

মাছের চাষ ঃ

বর্তমানে মাছের চাষ ও মাছের ব্যবসা কলইদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখন তারা মাছের চাষের জন্য পুরাতন পুকুরগুলিকে সংস্কার করছে ও অনেক জায়গায় বাঁধ দিয়ে জল আটকিয়ে কৃত্রিম জলাশয় তৈরী করে মাছের পোনা ফেলছে। এ ব্যাপারে তার মৎস্য বিভাগের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ১৯৭৮ সনে অম্পিতে মৎস্য বিভাগের সাত দিনের যে প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল তাতে শিক্ষার্থীদের প্রায় শতকরা ৭০% জনেই কলই সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অম্পি, তৈদু প্রভৃতি বাজারগুলি প্রায় ৬০ শতাংশ মাছ পার্শ্ববর্ত্তী কলই গ্রামগুলি থেকে আসে।

গ) তাঁত শিল্প ঃ

পূর্বে কলইরা তাদের জুমের কার্পাস থেকে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বীজ পৃথক করে সূতা তৈরী করে ঐ সুতা দিয়ে তাদের ঐতিহ্যপূর্ণ হস্তচালিত তাঁত দ্বারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরী করত। কিন্তু বর্তমানে তাদের অধিকাংশ বাজার থেকে রঙ্গীন সুতা ক্রয় করে তাদের জিনিষপত্র তৈরী করে থাকে।

ঘ) ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

বর্তমানে কলইদের ব্যবসার প্রতি যথেষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ইদানিংকালে কলই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কাঠের ব্যবসা, শুকনা মাছের ব্যবসা ও কয়েকটি ছোট ছোট মুদি দোকানের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গতবৎসর (১৯৭৮ইং) বৈশ্যমুনি পাড়ার শ্রীমদন কলই একটি সিনেমা হল চালু করেছেন এবং একটি চাউলেব

কলও দিয়েছেন। তার ফলে ঐ গ্রামের বেশ কয়েকজন বেকার যুবকের কিছুটা আয়ের সংস্থানও হয়েছে। কলইদের মধ্যে কয়েকজন বর্তমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। যন্ত্রণা পাড়ার শ্রীহরেন্দ্র কলই ও তার ছেলে শ্রীনবদ্বীপ কলই তৈদু বাজারও অম্পিতে হোমিওপ্যাথি ফার্মেসী খুলেছেন। চিকিৎসক হিসাবে তাদের বেশ সুনাম আছে।

তাছাড়া Insurance কোম্পানীগুলি গ্রামের দিকে এগিয়ে আসার ফলে কলইদের মধ্যে অনেকেই গরু বাছুর, ইত্যাদি প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে উদ্ভুত বিপদের হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেয়েছেন। এখন হঠাৎ কোন গাভী, বলদ ইত্যাদি মারা গেলে তাদের পূর্বের মত মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণ করতে হয় না। তাছাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি ন্যায্য মূল্যে পাট ক্রয় করার ফলে তাদের অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও কো অপারেটিভ সোসাইটিগুলির সঙ্গে এখন তারা বেশ সম্পর্কযুক্ত এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সুদের হার, ঋণ নেওয়ার নিয়ম কানুন প্রভৃতি সম্পর্কে এখন তারা বেশ জ্ঞাত। ১৯৭৯ সনে -Ampinagar Large Scale Multipurpose Co-operative Society তে ৬৬ জন অংশীদার কলই সম্প্রদায়ভূক্ত লোক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যপারে তাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে কিছুটা পরিবর্ত্তন এসেছে-তা নিশ্চিত।

এখন সরকারী চাকুরীর ফলে চাকুরীজীবী কলইদের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট দৃঢ় হয়েছে। তারা খুব মিতব্যয়ী এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও আর্থিক, এই উভয় দিক থেকে স্বচ্ছল হওয়ায় সমাজের নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমে তাদের হাতেই চলে যাচ্ছে। এই শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী কলইদের একাংশের মধ্যে বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুদ্ধি করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এই অবস্থার ফলে বর্ত্তমানে প্রাচীন শ্রেণীহীন কলই সমাজে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এক নতুন শ্রেণী বিন্যাস হতে চলেছে।

বর্ত্তমানে কলইদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রভাব তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। প্রাচীন সাম্যবাদী কলই সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা প্রবেশ করায় তাদের যৌথ পরিবারগুলির ঐক্যে ফাটল ধরতে শুরু করেছে।

রাজনৈতিক

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলইদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক

রাজনৈতিক দল এই উভয়েরই চিন্তাধারার সঙ্গে তারা বেশ পরিচিত। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস, সিপিআই (এম) ও উপজাতি যুব-সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের অনেকেই রেডিও, পত্র পত্রিকা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা সমিতির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক খবরাখবর রাখে।

গ্রামের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঃ

কলই সম্প্রদায়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর যুবক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সমাজ পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধদের সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব চলছে। যুবকরা যেখানে প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ভাবে সব কিছু করার পক্ষপাতী, বৃদ্ধরা সেখানে তাদের দীর্ঘদিনের অর্জিত সংস্কারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন না দিয়ে নতুন ও পুরাতন চিন্তা ধারার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানে আগ্রহী। কিন্তু যুবকদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে প্রতিরোধ করতে না পেরে ক্রমে ক্রমে তারা সমাজের নেতৃত্বের ভার যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে পর্দার অন্তরালে চলে যাচ্ছেন। বর্তমানের বৃদ্ধদের মধ্যে যারা এক সময় তাদের সমাজকে পরিচালনা করেছিলেন ও সমাজের সংহতি বজায় রেখেছিলেন তারা এখন সমাজের কাজ কর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন এবং ঘরে বসে ধর্ম-কর্মে মনযোগ দিচ্ছেন। সুতরাং যদিও যুবকরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছেন কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় তাদেরকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এর ফলে তাদের এই প্রাচীন সামাজিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

।। ধর্মীয় ।।

কলইদের পূজাপার্বণের সঙ্গে সমতলবাসী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর (বাঙ্গালীদের) আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজা পার্বণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কলইরা তাদের চিরাচরিত-নক্‌সুপূজা, গাঙপূজা, কেরপূজা, গড়িয়াপূজা, লাম্প্রাপূজা প্রভৃতির সঙ্গে বৃহত্তর সমতলবাসী জনসাধারণের লক্ষ্মী পূজা, ত্রিনাথ পূজা, সরস্বতী পূজা, প্রভৃতি পূজা-পার্ব্বণও করে থাকে। তাদের পূজাপার্ব্বণে অচাই (কলই সম্প্রদায়ের পুরোহিত) এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত উভয়েই পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি

অনুষ্ঠানেও বাঙ্গালীদের কিছু কিছু প্রভাব উপর পড়েছে। কলইদের বিবাহ, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি শুভকর্মের দিন পঞ্জিকার মাধ্যমে স্থির করা হয়।

কলইদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধব্যক্তি আছেন-যারা প্রত্যহ রামায়ণ,মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। তাদের মধ্যে বৈষ্ণবও শাক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই আছেন। তাদের অনেকের বাড়ীতেই দেবতার একটি আসন আছে। অনেকে তুলসীর মালাও পরিধান করেন। শ্রীঅনুকূল ঠাকুর ও শ্রীস্বরূপানন্দ স্বামীর অনেক শিষ্য কলইদের মধ্যে আছেন। তাদের অনেকেই তীর্থ উপলক্ষে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, কলকাতা প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। তাদের মধ্যে অনেকে দারিদ্রতাকে উপেক্ষা করেও মৃত পিতামাতার আত্মার মুক্তির জন্য গয়া গিয়ে পিণ্ডদান করেন ও গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন করেন।

বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে কলই যুবকদের কিছু অংশের আচার ব্যবহারে বেশ পরিবর্ত্তন এসেছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন এবং এই ধর্ম প্রচারে একটা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন। মিশনারীরা কক্‌বরক্ ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করায় তাদের আবেদন কলই জনসাধারণের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া লেখাপড়াও বিভিন্ন প্রকার সুযোগ প্রদান করায় মিশনারীরা তাদের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাবে কলই যুবকরা ঐ ধর্মে দীক্ষিত বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, গান, বাজনা আদব-কায়দায় তাদের প্রাচীন রীতি-নীতিগুলির পরিবর্ত্তে পশ্চিমী সভ্যতার দিকে অধিকতর আকর্ষিত হচ্ছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে তাদের মধ্যে বর্ত্তমানে একশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে তাদের চিরাচরিত পূজাপার্ব্বণের আকর্ষণ কমে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে কলই সম্প্রদায়ের উপর তাদের আবেদনের বিশেষ প্রভাব পড়েনি। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে উপজাতিদের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তা এই স্বল্পসংখ্যক খ্রীষ্টান কলইদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে ঃ

L.P . Vidyarthi G B.K. Rai -এর মতে "From the point of view of changes occuring in the Social Organization, Cultural contents and personality formations among Tribal Christian, in general, Christianity has provided the first model of Westernization in the tribals in the shape of 'Church Organization', Western education and above all Western values and morals'. (L.P.Vidyarthi, B.K. Rai / The Tribal Culture of India : Page 460)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কলইদের পূজাপার্বণ ও প্রচলিত রীতিনীতি তাদের সমাজের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং তাদের সমাজের প্রাচীন নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন যে , এই পূজা পার্ব্বণগুলি তাদের সামাজিক বন্ধনকে আটুট রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং এগুলি উঠে গেলে তাদের সামাজিক শাসনব্যস্থা শিথিল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তাদের চিরাচরিত পূজাপার্ব্বণগুলির সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে বৃদ্ধরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না।

।। পোষাক পরিচ্ছদ ।।

পূর্ব্বে রিয়াং বা মরশুমদের মত কলহ টাকারমালা (রাং-বোতাম), পুতির মালা, রূপার চুড়ি, কলার মালা ইত্যাদি পরিধান করত। কিন্তু সামাজিক , অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে এবং আধুনিকতার প্রভাবে জমাতিয়াদের মত কলইরাও তাদের প্রাচীন অলংকারগুলির ব্যবহার পরিত্যাগ করেছে।

এখন কলই মেয়েরা বাঙ্গালীদের মত বাজার থেকে তৈরী করা কানের দুল, গলার হার, ও হাতের জন্য কাচের চুড়ি ইত্যাদি কিনে পরিধান করে। অবশ্য কলই মেয়েরা তাদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে এখনও তাদের প্রাচীন পাচরা (শরীরের কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত ঢাকা যায় এরূপ একটি কাপড়), রিয়া, (বক্ষ আবরণী), চাদর ইত্যাদি তারা নিজ হাতে তৈরী করে এখনও ব্যবহার করে। অবশ্য এগুলির রং ও নমুনার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। সময় সময় কলই মেয়েরা শাড়ীও পরিধান করে। পূর্বে কলই মেয়েরা চুলের সিঁথি কাটত না এবং তা দেখেই কলই মেয়েদেরকে অন্যান্য উপজাতি মেয়েদের থেকে পৃথক করা যেত। কিন্তু বর্ত্তমানে তারা তাদের মাথায় চুলের সিঁথি কাটে।

কলই পুরুষদের পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এসেছে। পূর্বে কলই পুরুষরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ধূতি পরিধান করতেন কিন্তু বর্তমানে তারা বাজার থেকে মিলের তৈরী কাপড় পরিধান করে থাকে। কলই যুবকরা বর্তমানে অনেকেই প্যান্ট-শার্ট পরিধান করতে আরম্ভ করেছে। শহরের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাদের মধ্যে অনেকে পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চাল চলনে অতি আধুনিকতার অনুকরণ করার পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। পূর্বে কলই পুরুষরা তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মের জন্য তাদের নিজস্ব তৈরী এক প্রকার মজবুত শার্ট (কাচলই বরক) পরিধান করত। বর্তমানে এই শার্টের ব্যবহারও অনেকাংশেই কমে গিয়েছে।

।। গান বাজনা ।।

গান বাজনার দিকে ত্রিপুরীদের মত কলইদেরও একটি সহজাত আকর্ষণ আছে। কলই শিল্পীদের অধিকাংশের বাড়ীতেই হারমোনিয়ম, তবলা, দু-তারা , ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র আছে। ককবরক গান ছাড়াও বাংলা ও হিন্দী গান তারা ভালভাবে গাইতে পারে। তাছাড়া বাংলা ও হিন্দীগানগুলির সুরের অনুকরণ করে কক্‌বরক ভাষায় ঐ গানগুলির সুর দেওয়ার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে এসেছে। আধুনিক বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী গানগুলির অনুকরণ করার প্রভাব তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ গানগুলি ভোলার পথে। তাদের মধ্যে প্রাচীন গানগুলির মূল্যবোধ দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং এখনই এগুলি সংরক্ষণে উদ্যোগী না হলে অচিরেই এগুলি বিলুপ্ত হবে।

।। শিক্ষা ।।

শিক্ষার দিকেও কলইদের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি কলই পাড়াতে একটি করে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। অনেক কলই ছেলেমেয়ে এখন কলেজে পড়াশুনা করছে। শহরের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির হোস্টেলগুলিতে অনেক কলই ছাত্র-ছাত্রী থেকে পড়াশুনা করার ফলে তাদের আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। শহরের প্রভাবের ফলে গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে তাদের পক্ষে কষ্টকর হচ্ছে। কলইদের একটি শ্রেনীর মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা শিলং, চুরাচানপুর , নাগাল্যাণ্ড , মিজোরাম প্রভৃতিস্থানে গিয়ে পড়াশুনা করলে তাদের প্রকৃত উন্নতি হবে। উপরোক্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাদের কয়েকজন ছাত্র ঐ সব স্থানগুলিতে পড়াশুনা করতে গিয়েছিল এবং কয়েকজন ফেরৎও এসেছে। যারা ফেরৎ এসেছে তাদের অনেকেই ঐ সব স্থানগুলির চিন্তাধারা-আচার, আচরণকে কলই সমাজে চালু করতে আগ্রহী এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

।। মিশ্র সংস্কৃতি ।।

কলইদের সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে তাদের সমাজের অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত ১০ (দশ) বৎসর কলইদের সঙ্গে বাঙ্গালী, বিহারী, মণিপুরী প্রভৃতি জাতি এবং ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে অনেকগুলি বিবাহ হওয়ার ফলে কলই সমাজে এক মিশ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও শহরের এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাজারগুলির সংস্পর্শে থাকার ফলে আধুনিক সভ্যতার প্রভাব তাদের মধ্যে যথেষ্ট পড়েছে। বর্ত্তমানে অনেক কলই বাড়ীতেই ঘড়ি, রেডিও, সাইকেল প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। অনেক কলই বাড়ীতেই চা-পানের ব্যবস্থা আছে। তাদের মধ্যে অনেকে বাজারে বসে চা পান করতে অভ্যস্থ। কলইদের মধ্যে এখন মদ্য পানের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। বর্ত্তমানে তাদের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই একটা পছন্দ করেন না। তাছাড়াও কলইদের নিত্যব্যবহার্য্য আসবাবপত্র, রান্না করার পদ্ধতি, ঘরদরজা তৈরীর নমুনা, খাদ্যদ্রব্য চিন্তাধারা প্রভৃতি সব ব্যাপারেই এক বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছে এবং প্রতিনিয়ত এই পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কলইরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে বজায় রাখতে পেরেছে। উন্নত মানুষ অনুন্নত মানুষকে একেবারে গ্রাস করতে পারে না। আবার অনুন্নত মানুষও উন্নত মানুষকে অস্বীকার করতে পারে না। উভয়ের মিলন মিশ্রনে যে সংস্কৃতি তা মিশ্রসংস্কৃতি। মিশ্রসংস্কৃতির মধ্যে উন্নত ও অনুন্নত মানুষের সাংস্কৃতিক উপাদান মিলেমিশে থাকে।

কলই সমাজকে এক আধুনিক উন্নত সমাজে রূপান্তরিত করার দায়িত্বে কলই সমাজের যুবকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত যুবকরা কুসংস্কার মুক্ত হয়ে আধুনিক মানসিকতা নিয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের প্রাচীন রীতিনীতিগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পেরেছে। এব্যাপারে তারা সমাজের শিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে তের সদস্যের এক গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলীর একটি খসড়া অনুমোদন কমিটি নির্বাচন করে যারা সংশোধন প্রক্রিয়াকে যুগপোযাগী করে সম্পন্ন করে। এর ফলে সামাজিক শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা অনেক ত্রুটিমুক্ত ও গতিশীল হয়েছে এবং সমাজের লোকদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। তাদের গঠনতন্ত্রে পরিচালনসভার গঠন পদ্ধতি, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সদস্যদের যোগ্যতা সদস্যপদ খাবিজ হওয়ার কারণ, সামাজিক বিচার ব্যবস্থা, পূজাপার্বন বিধি, বিবাহ পদ্ধতি, কলই অধ্যুষিত অঞ্চল গুলির পরিচালনার সুবিধার জন্য পুনর্গঠন ইত্যাদি।

তাছাড়া তাদের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী আছে। সমাজ পরিচালন সভা সঠিকভাবে সমাজ পরিচালনায় ব্যর্থ গলে উক্ত উপদেষ্টা মণ্ডলী সমাজ পরিচালন সভার দায়িত্ব ও ক্ষমতা সাময়িকভাবে নিজ হাতে নিতে পারে। সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে কলই সম্প্রদায়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অতিনগন্য। এক্ষেত্রে সমাজের বিচারকগণ বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে থাকেন। সমাধানে যদি বিচ্ছেদ

হয় তবে আনুষঙ্গিক সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা পূর্বক বিচ্ছেদকারীর জরিমানা ধার্য করা হয়।

পরিচালন সভার সদস্য হতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বঞ্চনীয় এর ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করছেন এবং তাদের গ্রহণ যোগ্যতা ও অনেক বেশী।

সামাজিক তহবিলের টাকা সরকারী ব্যাঙ্কে রায় ও কামছিকাউ এর যৌথ একাউন্টে রাখা হয়। উন্নয়ন মূলক কাজ ও সমাজের গরীব ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা করা হয়।

ডাইন সন্দেহের বিচার সাধারণত কলই সমাজে হয়না। কিন্তু ডাইনি সন্দেহে যদি মারামারি হয় এবং সেই মারামারির জন্য যদি কেউ বিচার প্রার্থী হয় তখন সেই মারামারির বিচার সমাজিকভাবে করা হয়। ডাইনি সন্দেহের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করা হয়।

সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানে অনুমোদনপাওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্রে সমাজের রায় / গাইলিম / কামছিকাউ কে উদ্দেশ্য করে আবেদন করতে হবে।

কলই সমাজে সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমানে তারা কতগুলি আধুনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন ছোট শিশুকে দত্ত হিসাবে গ্রহণ করার সুনির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্রে আবেদন করতে হবে, সামাজিক বিবাহ-অনুষ্ঠানে সামাজ পতিদের নিমন্ত্রণ করা হএবং উক্ত বিবাহরে সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য অথবা অন্য সমাজ থেকে কলই সমাজে অন্তর্ভূক্তি ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট আবেদন পত্র আছে। অনুরূপভাবে বিচারের জন্য বাদী বিবাদীকে বিচারের তারিখ ইত্যাদি অবগতির জন্য সমনজারি / নির্দেশ নামার ও সুনির্দিষ্ট বিধান আছে।

শেষ কথা

'লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায়' নামে একটি ছোট্ট বইটির উপসংহারে কয়েকটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। এই বইটি লেখার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি যখন বিভিন্ন কলই গ্রামে গিয়েছি, তখন আমি লক্ষ্য করেছি তাদের সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই- এমনকি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাদের নিজস্ব ইতিহাস, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত নন। তবে তাদের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মেছে এবং তারা আমাকে এই বই রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছে যে কলইরা কি কুকি বংশোদ্ভব, না ত্রিপুরী বংশোদ্ভব, তারা কোথা থেকে এসেছে, ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রশ্নগুলি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হলেও কোন জাতি বা উপজাতি দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির উত্তর দেয়া যে খুবই কঠিন তা তাদেরকে বোঝাতে সময় সময় সমর্থ হয়েছি, কখনও হয়েছি ব্যর্থ। তবে তাদের এইসব সরল প্রশ্ন যে তাদের জীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অভাবেরই ফল-তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

এব্যাপারে আর একটি সমস্যা হল যে আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় সরকারী বা বেসরকারীভাবে কলইদের সম্পর্কে কোন লেখা না থাকায় তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের স্পষ্ট ধারণার অভাবের ফলে সমগ্র কলই সম্প্রদায়ের বংশবিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত প্রয়োগ করে থাকেন। এর ফলে যারা কুকি বংশ থেকে এসেছে তারা সমগ্র কলই সম্প্রদায়কেই হালাম বলে মনে করে। পক্ষান্তরে, যারা ত্রিপুরী বংশ থেকে এসেছে তারা সমগ্র কলই সম্প্রদায়কে ত্রিপুরী বংশোদ্ভব বলে ভাবেন।

সুতরাং বর্ত্তমানে ত্রিপুরার কলই তথা সমগ্র ত্রিপুরার প্রত্যেকটি উপজাতি সঠিক ইতিহাসের খুবই প্রয়োজন। সঠিক ইতিহাসের মাধ্যমে যখন তারা বুঝতে পারবে যে

বর্ত্তমানে কোন জাতি বা উপজাতি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ (অর্থাৎ একই গোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ) নয়, এবং দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে একটি অপরটির সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কযুক্ত, তখনই বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে জাতি গঠনে সাহায্য করবে।

তাছাড়া এই সম্প্রদায়ের যারা নিজেদের সংস্কৃতি ও প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি কিছুটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং সব ব্যাপারে কিছুটা অতি-আধুনিকতার গন্ধ খোঁজেন, তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রাচীন রীতিনীতির যে সামাজিক মূল্য আছে তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

কলইদের সম্পর্কে লিখিত তথ্যের অভাবে ঐ সমাজের প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখ থেকে তাদের ত্রিপুরায় আগমনের কিছু তথ্য, বিভিন্ন প্রাচীন স্থানের নাম ও ব্যক্তির নাম সম্পর্কে যে সমস্ত বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সংক্ষিপ্তভাবে যথাসম্ভব উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। এই ছোট্ট বইয়ে সমগ্র কলই সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, তবে ভবিষ্যতে তাদের ইতিহাস রচনায় এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে সাহায্য করবে বলে আমি মনে কির।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে — কলইদের ভাষার এখন পর্যন্ত কোন লিপি নির্বাচিত না হওয়ায় তাদের বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে কোন নির্দিষ্ট বানান পদ্ধতি অবলম্বণ করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত।

গ্রন্থ পঞ্জি

১। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত — উদয়পুর বিবরণ

২। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত — ধর্মনগর বিবরণ

৩। শ্রী গোপাল সিংহ কলই — কলই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী

৪। জগদীশ গণচৌধুরী — ত্রিপুরা সন্ত চরিতমালা, প্রকাশক ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, ২০০২ ইং

৫। শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন — শ্রী রাজমালা, প্রথম লহর, দ্বিতীয় লহর, তৃতীয় লহর

৬। কৈলাস সিংহ — রাজমালা

৭। L.P. Vidyarthi and Binai Kumar Rai — The Tribal Culture of India

৮। Ramgopal Singh — The Kukis of Tripura

৯। সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা — ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণী, ১৯৩১ইং, ত্রিপুরা স্টেট প্রেস, ১৩৪৩ ত্রিং

১০। শঙ্কর সেনগুপ্ত — লোকবৃত্ত ঃ ক্ষেত্র নিরীক্ষার মুলসূত্র

১১। সুহাস চট্টোপধ্যায় — ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ

১২। শচীন্দ্র কলই — সামাজিক গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলিঃ কলই সমাজ ত্রিপুরা, ২০১২ ইং

১৩। ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার — শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা।

১৪। The Tribes of Tripura — Directorate of Research, Tripura

১৫। রিয়াং — শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

১৬। চাক্‌মা — শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

১৬। গড়িয়া পূজা — উপজাতি গবেষণাধিকার, ত্রিপুরা।

পূজার জন্য লামপ্রা ওয়াথপ্ বহনরত

জম্পুইজলা নিবাসী কলই সমাজের মান্য বয়োজ্যাষ্ঠ ব্যক্তিগণ

বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে
লামপ্রা ওয়াথপ পূজার দৃশ্য

গ্রামীণ কলইদের দৈনন্দিন জীবনচিত্র

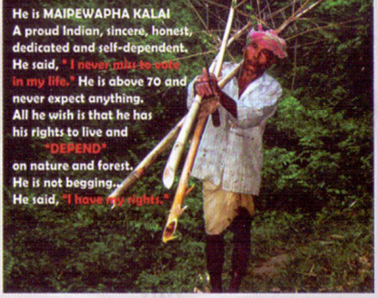

কলই সমাজের নূতন 'রায়'-এর নির্বাচনের পর সম্মাননা অনুষ্ঠান

কলই বৃদ্ধের তামাক সেবন

কলইদের কৃষি কার্য

কলই রমনীর জুমের ফসল আহরণ

কলই হস্তশিল্পীর বাঁশের ঝুড়ি তৈরী

খ্রীষ্টিয় মতে সদ্য বিবাহিত কলই যুবক ও রাংখল যুবতী

আধুনিক পোষাকে সজ্জিতা কলই যুবতী

কলই যুবক যুবতী

খ্রীষ্টিয় মতে কলই যুবক যুবতীদের প্রার্থনা অনুষ্ঠান

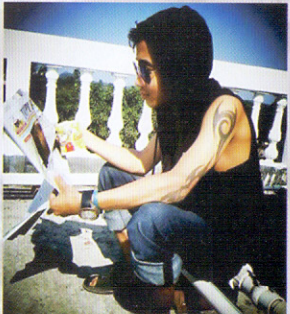

পশ্চিমী কায়দায় আধুনিক কলই

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে
নিবেদিত খাদ্য সামগ্রী

মৃতের উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য দান

শেষকৃত্য সমাপনের পর
সমবেত আনন্দ উৎসব

লেখক পরিচিতি

ডঃ প্রদীপনাথ ভট্টাচার্য্য

জন্ম ১৯৫১ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) সিলেট জেলার বানিয়াচঙ্গ গ্রামে। ১৯৬৬ সনে তিনি বানিয়াচঙ্গ লোকনাথ রমন বিহারী হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন । ১৯৭০ সনে MBB College থেকে B.A. Honours পাশ করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.A. করেন। পবর্তীকালে ১৯৮৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Sociology-তে Ph.D. Degree লাভ করেন।

কর্মজীবনের প্রথম দিকে শিক্ষকতা ও পরিবর্তী সময়ে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে Senior Research Officer পদে এবং শেষের দিকে Tripura Public Service Commission -এ Controller of Examinations পদে বৃত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের MRMD এবং Centre for study of Social Exclusion and Inclusive Policy Department -এ অতিথি অধ্যাপক হিসাবেও কয়েকবৎসর নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রী ভট্টাচার্য্য ব্যক্তিগত জীবনে উপজাতীয় জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গবেষণায় রত আছেন। তার লিখিত 'লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায়' 'The Garos of Tripura', 'The Jamatias of Tripura', 'Jamatia Folkore - A Sociological Study' ইত্যাদি বই এবং যুগ্মভাবে লিখিত 'Tea Plantation and Tribes of Tripura', Tribal Research Institute কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক ও গবেষকদের দ্বারা খুবই প্রশংসিত হয়েছে।

ISBN : 978-81-927167-9-4